জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ৩৪ ॥ ১৪ বর্ষ ॥ ১০ নভেম্বর জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা ॥ ১০ নভেম্বর ২০০৪ ॥

১০ নভেম্বর'৮৩ অমর হোক

১০ নভেম্বর '৮৩
অমর হউক

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়..... .... ২

এমএন লারমা: কিছু স্মৃতি কিছু অভিব্যক্তি- ধীর কুমার চাকমা ৩

প্রকৃতিপ্রেমিক এম এন লারমা- সঞ্জার চাকমা ৬

এমএন লারমার আদর্শ ও আত্মজিজ্ঞাসা- শক্তিপদ ত্রিপুরা ৯

গৃহযুদ্ধ ও প্রয়াত নেতার স্মরণে- আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক..... .... ১২

১০ই নভেম্বর ঃ শোক ও চেতনার- বনিতা চাকমা..... ....১৪

১০ই নভেম্বর শোক দিবস ঃ আত্ম-অনুসন্ধানের দিন- বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ১৫

সুভাষিণী দেওয়ান একজন আদর্শ মাতার নাম- জড়িতা চাকমা ২০

শহীদের তালিকায় রাসেল- উজ্জ্বল চাকমা..... .... ২২

সমঅধিকার আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা- তনয় দেওয়ান..... ..... ২৫

কবিতা

দৃঢ় শপথ-পপেন ত্রিপুরা..... ....৩০

আহ্বান- জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু..... ....৩১

গল্প

জুম্মদাহ কথা- অনির্বাণ ৩২

বিশেষ প্রতিবেদন..... ....৩৪

জনসংহতি সমিতির ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচী বানচালের জন্য ইউপিডিএফ, ওয়াদুদ গং ও সেনাবাহিনীর একটি অংশের অপতৎপরতা/ খাগড়াছড়িতে সেনা ও পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতি এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে হামলা/ নিরীহ ছাত্র জিম্পু চাকমাকে মাটিরাঙ্গা জোনে পিটিয়ে হত্যা/চিৎমরম এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক মংমং মারমাকে হত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলা/ বিডিআর কর্তৃক বরকল উপজেলার ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র ও বৌদ্ধ মন্দির ক্ষতি সাধন ও উচ্ছেদ/ বাঘাইছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠীর প্রহসন/ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন

প্রতিবেদন..... ....৫৯

সাংগঠনিক সংবাদ..... ....৬১

চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ'র অব্যাহত তান্ডবতা..... ....৭১

আন্তর্জাতিক..... ....৭৫

থাইল্যান্ডে চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি শীর্ষক প্রাথমিক সংলাপ/ ফিলিপাইনে এশীয় আদিবাসী নারী সম্মেলন/ জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ/ সন্তু লারমাকে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে যোগদানে সরকারের বাধাদান/ জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ/ অষ্ট্রেলিয়ায় মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদকের অংশগ্রহণ/ বার্সেলোনা সাংস্কৃতিক ফোরামে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি/ জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপির প্রতিনিধি

সংবাদপ্রবাহ ৭৮

মূল্য: ৩০.০০ টাকা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে একটি শোকাবহ দিন। এদিনে জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর ৮ জন সহযোগীসহ বিভেদপন্থী কুচক্রী 'গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ' চক্র'র হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাই এদিনটি জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেদনাবিধুর শোকময় দিন। এদিনে আমরা মহান প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিজেদের অমূল্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি।

সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন অবসান তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সকল সেনা সদস্যদের স্থায়ী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার বিধান থাকলেও এখনো পূর্বের মতো সেনাশাসন ও সেনা তৎপরতা পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন অঞ্চলে সেনাশাসন বলবৎ রেখে সে অঞ্চলের প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া এবং চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প গুটিয়ে না নেয়া তথা সেনাশাসন প্রত্যাহৃত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জুম্ম জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আজো সুদূর মরীচিকা হয়ে আছে।পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অবাধে তল্লাসী অভিযান, ধরপাকড়, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বসতিকারী সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইউপিডিএফ নামধারী একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নানাভাবে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, রাহাজানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ধরপাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন ও হত্যা, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, অফিসে হামলা ও ভাংচুর ইত্যাদি শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে, চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহতি পরে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ৩১টির মতো অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। বর্তমানে ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে কতক জায়গায় ক্যাম্প সম্প্রসারণ ও নতুন ক্যাম্প স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। অধিকন্তু 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন সেনাশাসন জারী করা হয়। এই সেনাশাসনের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবতা বিরোধী নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ৩ শতাধিক ঘটনায় অন্ততঃ ১১ শত লোক নির্যাতন ও হয়রানি শিকার হয়েছে। এছাড়া নিম্মোক্ত ৬টি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় হাজার খানেক লোক এবং নিহত হয়েছে অন্ততঃ ৫ জন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের অন্যান্য কোন অঞ্চলে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর মতো কোন সেনাশাসন নেই। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আজ দীর্ঘকাল ধরে সেনাশাসন চলছে। এ অঞ্চলের চুক্তি-পূর্ববর্তী সময়ের মতো প্রতিনিয়ত সেনা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার বলি হতে হচ্ছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ও জারিকৃত সেনাশাসন বৈধতা দানের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে এই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চলেছে।

এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণের দাবী হচ্ছে -১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে এবং নূতন করে ক্যাম্প স্থাপন বন্ধ করতে হবে; ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার করতে হবে; ৩) অতি সম্প্রতি জিম্পু চাকমাকে নৃসংশভাবে হত্যা এবং জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতনসহ সেনাবাহিনী কর্তৃক সকল ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক দোষী সেনা সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে: এবং ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিশেষে ১০ নভেম্বরের এই শোকাবহ দিনে সকল প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা দল, বুদ্ধিজীবী ও ব্যক্তিদের কাছে উদাত্ত আহ্বান আসুন- মহান নেতার আদর্শকে ধারণ করে জুম্ম জনগণের ভাগ্যকাশের কালো মেঘ অবসান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম সফল করে তুলি। #

এমএন লারমা: কিছু স্মৃতি কিছু অভিব্যক্তি

ধীর কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের মতো দুটি অবিচ্ছেদ্য নাম। এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস। ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস। ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে এই ইতিহাসে যোগ হয় একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। সেদিন ক্ষমতার মোহে অন্ধ গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে আটজন বীর যোদ্ধাসহ এম এন লারমা নিহত হন। এ দেশের মেহনতি মানুষ আর বিশ্ববাসী সেদিন হয়েছিল হতবাক। আর শোকসন্তপ্ত আপনজনের ঝরেছিল বেদনার অশ্রুজল। সেদিন থেকে প্রতিবছর ১০ নভেম্বর আসলে জুম্ম জাতি তার প্রয়াত নেতা ও যোদ্ধাদের স্মরণে অনুষ্ঠান করে আসছে। পাখি ডাকা ভোরে প্রভাতফেরী আর হাজারো শোকার্ত মানুষের পদভারে জেগে উঠে রাজপথ। রকমারী তাজা ফুলের সমারোহে ভরে যায় শহীদবেদী। আর সহস্র ফানুসের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয় রাতের আকাশ। কামনা করা হয় ১০ নভেম্বর ১৯৮৩-র ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এভাবেই প্রতিবছর নভেম্বর আসে আর চলে যায়। আজ ১০ নভেম্বর ২০০৪ প্রয়াত এম এন লারমার ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর অবর্তমানে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭টি বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র ২১ দিন বাকী। এ চুক্তি তারই দার্শনিক চিন্তার ফসল। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৮১ সালে অসুস্থ শরীরের শয্যাগত অবস্থায় বলেছিলেন- 'বন্ধুগণ, যে কোন কিছুর বিনিময়ে '৯০ সাল পর্যন্ত কষ্ট করে টিকে থাকতে পারলে জুম্ম জাতি আর ধ্বংস হবে না।' কিন্তু আমরা '৯০ দশকের দোড়গোড়ায় এসে তাকে হারালাম। তারপরও তাঁর ভবিষ্যতবাণী বৃথা যায়নি। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বলতে গেলে শুরুতে গুরু-শিষ্য হিসেবেই প্রয়াত নেতার সাথে আমার প্রথম দেখা। ১৯৬৮ সাল। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন বর্তমান দীঘিনালা উপজেলা সদরস্থ দীঘিনালা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় তখন সেটা সবেমাত্র সরকার অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রাজুয়েশন নিয়ে ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন একজন শিক্ষক হিসেবে। মিতভাষী, হালকা পাতলা গড়ন আর অসীম আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এ শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষকতার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। শিক্ষকতার পাশাপাশি জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার যে বিরামহীন সংগ্রাম ও সাধনা সেটা সচক্ষে না দেখলে বুঝা যায় না। তিনি ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবক মহলে একজন অকৃত্রিম বন্ধুও। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ক্লাসের পড়া আদায় করতে পারতো না তখন তিনি আক্ষেপ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মৃদু ভর্ৎসনা করতেন।

একদিন শ্রেণীকক্ষের একটি ঘটনা আমাদের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অভিভূত করেছিল। সেদিন তিনি আমাদের শ্রেণীতে পৌরবিজ্ঞানের পড়া নিচ্ছিলেন। সেদিন পৌরবিজ্ঞানের পড়া ছিল 'রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রের চারটি উপাদান। সে বিষয়ে আমাকে উপর্যুপরি বুঝানোর পরও তা আমার কাছে কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না। তার সর্বশেষ চেষ্টার পরও না। সবশেষে তিনি আমাকে আর কিছুই বললেন না। তার হাতে রাখা বইটা নিজের কপালে আছার মেরে টেবিলে নত মস্তকে বসে পড়লেন। চোখের জল ফেললেন নীরবে নিভৃতে। পরিশেষে শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে সোজা চলে গেলেন শিক্ষক কোয়ার্টারে নিজের শয়নকক্ষে। সেদিন আর বিদ্যালয়ে কোন ক্লাশ নিলেন না। সমগ্র বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব সমাজে সেদিনের ঘটনা অসীম ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার উৎস হয়ে থাকবে।

তিনি ছিলেন সদালাপী ও শৃঙ্খলা পরায়ণ। গুরুজনদের দেখামাত্র পদধুলি নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরও তাই অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল ও উদারপ্রাণ। তখন পাকিস্তানী পুলিশের সাথে আমাদের ছাত্রদের মারামারিতে জিততে না পারলে দুঃখ পেতেন। সমগ্র দীঘিনালা এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইয়ের কাছে তিনি 'মঞ্জুবাবু' নামেই পরিচিত। কোন অভিভাবক নিজের ছেলের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হলে তার সাথে দেখা করতেন। তিনি তার বেতন-ভাতার সিংহভাগ গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পিছনেই ব্যয় করতেন। যার কারণে টেবলেট খাওয়ার সামর্থ্যও তার থাকতো না। এমন দিনও তাঁর গেছে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বাইরে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনমূলক ভ্রমণকাহিনী, মহাপুরুষের জীবনী, বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়তে বিলি করতেন এবং যথারীতি মৌখিক পরীক্ষা সহকারে জমা নিতেন। পড়াশুনায় ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে তিনি ক্লাশ করাতেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা, বক্তৃতাদান ও তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। এসব কর্মকান্ড আমাদের জন্য পরম আশীর্বাদ হয়ে আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক বিকাশের দিকেও তিনি ছিলেন সমান যত্নবান। খেলার মাঠে খেলোয়ার ও দর্শকের ভূমিকায় উপস্থিত থাকতে হতো ছাত্র-ছাত্রীদের। জুম্ম জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সচেতন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে একবার জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসার নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। তখন ছাত্রীদের মধ্যে পিনোন-খাদি ব্যবহার আর ছাত্রদের মধ্যে খাদির ঝোলা (খাদির তৈরী ঝুলন্ত থলি) ব্যবহার প্রসার লাভ করে।

শিক্ষক হিসেবে তাঁর অনন্য অবদানকে অনাগত প্রজন্ম ও বুদ্ধিজীবীরা যদি গ্রহণ করতে পারেন তা দেশ ও জাতি গঠনে সহায়ক হবে। সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ১৯৬৮ সালে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এল এল বি পড়ার জন্য। চোখের জলে সেদিন তাঁর গুণগ্রাহী অনেক অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম। তারপর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। তার কিছুদিন পর ১৯৭২ এর শুরুতে সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় তিনিও সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়ান। তখন সমগ্র দেশে আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবলমাত্র কতেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় (বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে) সংশ্লিষ্ট থানার সমন্বয়ে বাংলাদেশ রিজার্ভ পুলিশ ক্যাম্প অস্থায়ীভাবে বসানো হয়েছিল। তারই পাশাপাশি থানাসমূহের পুনর্গঠন কাজও শুরু হয়। এমন সময়ে দেশের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের খবর জানানো হয়। তিনিও পুলিশ বাহিনীতে জুম্ম তরুনদের ভর্তির সগহযোগিতা দিতে এগুলেন। খবর দেন খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটির সব থানা এলাকায়। সে অনুসারে আমিও ১৪ জনের একটি গ্রুপসহ রাঙামাটিতে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু পক্ষাধিককাল নিষ্ফল ঘোরাফেরার পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তখন আমাদের কারও পকেটে কানাকড়িও ছিল না। শেষ অবধি তখনকার শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতা (পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি) রূপায়ণ দেওয়ান (রিপ) এর আর্থিক সহায়তায় আমরা বাড়ীর উদ্দেশে রাঙামাটি ত্যাগ করলাম।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে একটা হাস্যকর ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে এ রকম- সেদিন আমাদের গ্রুপের ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। তারও আগে পুলিশ লাইনে আনুষঙ্গিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম আমাদের দলের প্রায় অর্ধেক সদস্য। ডাক্তারী পরীক্ষাতে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুতি মুহূর্তে আমাদেরই একজন অতি উত্তপ্ত চায়ের কাপ মুখে দেয়াতে জিহ্বায় ফোসকা লাগে। ডাক্তারী পরীক্ষাতে এই ফোসকা দূরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে ধরা পড়লো। আর ছয় মাস বিশেষ ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিলেন। তার সঙ্গে পুলিশে ভর্তির অযোগ্য ঘোষণাসহ বিদায় দিলেন। এই পরীক্ষার আগেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সদস্যদেরকে তুচ্ছ কারণেই ডিসকোয়ালিফাইড করা হয়েছিল। গ্রামে গিয়ে এসব কথা জানাজানি হয়। নূতন সরকারের প্রতি জুম্মদের অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে। উপরন্তু শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের চাপিয়ে দেয়া উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ তথা হুমকী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে তিনি শ্লোগান দিলেন 'গ্রামে চলো'। আমরা তাঁর নির্দেশে সাংগঠনিক কাজ শুরু করতে গ্রামে চলে গেলাম। কাজের মাধ্যমেই বছর গড়িয়ে ১৯৭৩ আসলো। গঠিত হলো সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। আমরা পুলিশের গ্রুপ এ বাহিনীতেই নাম লেখালাম।

কালক্রমে ১৯৭৫ সাল ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকান্ড দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটায়। পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। বাইরে থাকা আর সমীচিন হবে না মনে করে তিনি সরাসরি ভিতরে চলে আসলেন। গুরু-শিষ্য হিসেবে ফেলে আসা দিনের পর শুরু সশস্ত্র সংগ্রামী জীবন। এর পর ৮০-র দশকে এই আন্দোলনে শরীক হলেন তারই অনুসারী আরও অনেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী। তারা হচ্ছেন শহীদ শুভেন্দু প্রভাস লারমা(নেতার অগ্রজ), অপর্ণাচরণ চাকমা, শহীদ জাপানী রঞ্জন চাকমা (বিকাশ), সুবাস কুমার চাকমা (মনোজ), রঞ্জন বিকাশ চাকমা (উত্তরণ) এবং আরও অনেকে। সর্বোপরি তার যোগ্যতম উত্তরসুরী, অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)ও। তাই জেনারেল মঞ্জুর জেএসএসএর সশস্ত্র আন্দোলনকে 'হেডমাস্টার্স ওয়ার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

তবে সংগ্রামী জীবনের শুরু থেকেই ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতেই পারেননি। তাঁর স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা থাকলেও তাদের বাড়ীতে অধিকাংশ সময় কেটে যেতো বাড়ীতে তার আগমন প্রতীক্ষার প্রহর গুণে গুণে। অন্যদিকে তিনি কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতেন আন্দোলন পরিচালনা, কর্মীদের পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের কথা ভেবে। কর্মীরা ছুটি থেকে কাজে যোগদান করতে আসলে তিনি খোঁজখবর নিতেন। বাড়ীতে সবাই সুস্থ আছে কিনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। শত সমস্যার মাঝেও আন্দোলনে টিকে থাকার জন্য উৎসাহ যোগাতেন। অবসর মুহূর্তে নিরক্ষর কর্মীদের স্বাক্ষর জ্ঞান দিতেন। তাদের কাছ থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ কেমন আছে সে সব জেনে নিতেন।

আজ এম এন লারমার ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি এক নীরব ছবি বটে, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর সরব কণ্ঠে তিনি রেখে গেছেন অনেক জ্ঞান সম্পদ। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীতে যখন থেকে মানুষের ইতিহাস জানা যায় কিংবা তারও আগের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেবল দু'ধরনের জ্ঞানই দেখা গেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম চলে সে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে একধরনের জ্ঞান জন্মে। আর একধরণের জ্ঞান জন্মে শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। এ দুটি জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক বাস্তবতার নিরিখে পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেছেন। তাই সমগ্র পার্টি তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের কাছে ঋণী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে প্রগতিশীল চিন্তাধারার ভূমিকার উপর তাঁর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকে যারা কাজ করে গেছেন তারা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী আর যারা তা পারেনি তারা চার কুচক্রী তথা চরম প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবেই সমাজে চিহ্নিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়েও প্রগতিশীল ধারা বিশ্বাসী যারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে সর্বত্র চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। বাকী যারা চুক্তিবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও শাসক-শোষকগোষ্ঠীর লেজুরবৃত্তি করে আন্দোলনে আঘাত হেনে চলেছে বিভিন্নভাবে। বাংলাদেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী সংগঠন, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও জুম্ম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি এবং সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। গড়ে তুলেছে 'বাঙালী গণ পরিষদ', 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ', 'সমঅধিকার আন্দোলন' ইত্যাদি ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠন। এইসব সংগঠনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের জন্য ঐ সংগঠনগুলো নেপথ্যে কলকাঠি নেড়ে আসছে তা আজ আর কারো অজানা নয়। কারণে অকারণে তুচ্ছ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাই তাদের প্রধান হাতিয়ার। এটা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি হতে পারে না।

আমরা সবাই জানি যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত চুক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণঅধিকার আন্দোলনের একটি সনদ। এই চুক্তিবলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ছিল অনেকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত। সে অনুসারে বিভিন্ন দফায় মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা-জমি ন্যায্য মালিক বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। উপরন্তু কতেক ক্যাম্প পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছিল। আবারো সম্প্রতি তিন পার্বত্য জেলা হতে (বান্দরবান ৯টি, রাঙামাটি ১০টি ও খাগড়াছড়ি ৬টি) মোট ২৫টি পুলিশ ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া এবং ৯০০ পুলিশ সদস্যকে অন্যত্র বদলীর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ২ হাজার ৭শত পুলিশ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে প্রত্যাহার করা হবে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ৮০-র দশকে সকল নিরাপত্তা সদস্যকে সেনাবাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ বছর পরও সে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অপরপক্ষে বর্তমান এ হাল দেখে অভিজ্ঞমহল মনে করেন যে, সম্প্রতি পুলিশক্যাম্প প্রত্যাহারের পর পার্বত্যাঞ্চলের সর্বত্র সেনাক্যাম্প পুনর্বহাল ও পূর্বের চেয়ে আরও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতে পারে। এসব কর্মকান্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

ইহাও সর্বজনবিদিত যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর বিলুপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু ইদানিং বলা হচ্ছে যে, 'কাপ্তাই-রাঙামাটি হতে অবাধে বনজ সম্পদ পাচার হচ্ছে। এতে শান্তিবাহিনী ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হাত রয়েছে। পার্বত্য চুক্তিতে বন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।' তাই বনজসম্পদ পাচার রোধ ও সন্ত্রাসীদের মোকাবেলার জন্য পার্বত্য চুক্তি সংশোধন ও আর্মি ক্যাম্প বাড়ানোর পক্ষে সুপারিশ করা হযেছে (ভোরের কাগজ)। এই সুপারিশ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পার্বত্য চুক্তি-উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মূল্যবান। আজ চুক্তি-উত্তরকালে শান্তিবাহিনী না থাকায় বনজসম্পদ সংরক্ষণে বর্তমানে বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে চুক্তি সংশোধন ও আর্মি ক্যাম্প বাড়ানোর যুক্তি সম্পূর্ণ অবান্ত র। বরঞ্চ পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বনজসম্পদ সংরক্ষণ ও সন্ত্রাস বন্ধ অনায়াসে করা সম্ভব। পার্বত্য চুক্তি লংঘন করে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় আমলা ও সমতলের বড় বড় অসৎ ব্যবসায়ীদের মদদে বনজসম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছে। অবৈধ গাছ ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ট্রাক বোঝাই কাঠের আসবাবপত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচাররোধে উপযুক্ত আইনের প্রয়োগ আছে বলে মনে হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা এ বনের আদিবাসী, এ দেশের বনের সাথে যাদের জীবন জীবিকা নিবিড়ভাবে জড়িত তাদেরকে ঠকিয়েই স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজসম্পদ পাচারের কাজে ব্যস্ত আছে।

পক্ষান্তরের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল করার কোন আইন কিংবা সুযোগ নাই দেখে একটা নামেমাত্র যুক্তি দাঁড় করিয়ে চুক্তি বাতিলের বিকল্প হিসেবে স্বার্থান্বেষী মহলের সুবিধানুসারে সংশোধনের পাঁয়তারা চলছে। সন্ত্রাস দমনের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'অপারেশন উত্তরণ' জোরদার করার সুবিধার্থে বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের ছত্রছায়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে। দেশের সমতল অঞ্চলে সন্ত্রাসী ও র‍্যাবের মধ্যে ক্রসফায়ারে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসী নিহত হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হলে সেটা দেশের জন্য মঙ্গল। কিন্তু যদি নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা হয় সেটা শান্তিকামী জনগণের কারো কাম্য নয়। কে সন্ত্রাসী কে সন্ত্রাসী নয় সেটা বাছবিচার ব্যতিরেকে সন্ত্রাসী দমনের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষ খুন হওয়াকে কোনভাবেই সমর্থন দেয়া যায় না। সমতলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এক নয়। তাই এখানে 'র‍্যাব' নামানো, 'অপারেশন দাবানল' অথবা 'অপারেশন উত্তোরণ' জোরদার করার জন্য সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সেনাক্যাম্প বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নেই। এরকম সামরিক কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির অবনতি বৈ উন্নতি বয়ে আনবে না। তাদের দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নই বুদ্ধিমানের কাজ বলে অভিজ্ঞমহলের অভিমত। আমি সেই অভিমতকে সাধুবাদ জানাই। দীর্ঘ দু'যুগের অধিককাল ধরে জুম্ম জনগণ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এসেছেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন জুম্ম জনগণ মনেপ্রাণে কামনা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিকল্প কিছু নেই। প্রয়াত নেতা ও শহীদদের মহান আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। তাই আসুন সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পদদলিত করে প্রগতিশীল শক্তির পতাকাতলে সমবেত হই এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করি। #

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হউন।

-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহজতি সমিতি

প্রকৃতিপ্রেমিক এম এন লারমা

সঞ্চার চাকমা

আজকালকার দিনে আমরা পরিবেশবাদী আন্দোলনের নামকরা সংগঠন গ্রীনপীচ (Green Peace) এর নাম প্রায়ই শুনে থাকি। বস্তুতঃ পৃথিবীব্যাপী ইহার কার্যকরী প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। ইহার সৃষ্টি এবং উত্থানের ক্ষেত্রে প্রতি পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। গ্রীনপীচ কর্মীদের পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষার সংগ্রামে বিবিধ প্রকারের অত্যাচার ও নিগৃহীত হতে হয়েছে। এমনকি ঘামের সহিত ঝড়েছে রক্ত। কিন্তু এ যৌক্তিক আন্দোলনের গতি কোন অত্যাচারই থামাতে পারেনি। ব্রহ্মান্ডের সবচেয়ে সুন্দর গ্রহটিকে মানবজাতির জন্য নিরাপদ রাখার ব্রতে আজ দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে গড়ে উঠেছে প্রকৃতি প্রেমিকদের সংগঠন। পরিবেশ সচেতনতার শাণিত তরবারীর আঘাতে মুনাফাখোর আর শোষকশ্রেণীর কালো হাত ভেঙে গেছে এবং যাচ্ছে। তাই উন্নয়নের নামে সর্বগ্রাসী তত্ত্বটিকে নতুন করে সংজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হচ্ছেন তথাকথিত উন্নয়নকার্মীরা। বিশ্বের দেশে দেশে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের কাতারে মেধা পাটেকর একটি সার্থক নাম।

নর্মদা নদীর অবস্থান শুধু বর্তমান নয়, পৌরাণিক আমলেও এ নর্মদার স্থান বহুল আলোচিত। এ নর্মদা নদীর উপর ভারত সরকারের এক পরিবেশ বিপর্যয়ী বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাকে তথাকথিত উন্নয়নের জন্য ব্যাখ্যাত হয়। কার্যত উজানে ইহার পরিবেশ বিপর্যয়কারী যে প্রভাব জনগোষ্ঠির উচ্ছেদ এবং পরিণতি তা মূল পরিকল্পনায় উপেক্ষিত থেকে যায়, অন্ধকারে রাখা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে। এ দিকটাকে তুলে ধরে মেধা পাটেকর এগিয়ে আসেন এবং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর কর্তৃপক্ষ নর্মদা নদীর বাঁধকে ব্যাপক সংস্কার ও সংশোধন করতে বাধ্য হন।

বস্তুতঃ একচোখা উন্নয়ন নীতির বলি যারা হয়ে থাকেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের চক্ষু আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। আজ আমরা উন্নয়নের পরিকল্পনায় অনেক সচেতনতা দেখতে পাই, তার মধ্যে পরিবেশ বিপর্যয় এবং তদসৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহ্যের বিপর্যয় তথা রুজি রোজগারের উপর ক্ষতিকর দিকটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। একটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে মানবিক ও জৈবিক সকল অবলম্বনকে সংকটাপন্ন করে অস্তিত্ব রক্ষার উপায়সমূহকে, অস্তিত্ব রক্ষার উপায়সমূহকে আরও কঠোরতর করে তুলে এ প্রকারের যে উন্নয়ন তা প্রকৃত উন্নয়ন না বলাই সঙ্গত। বিশ্ব অর্থায়ন যুগে গ্রীনপীচ আর নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মত পরিবেশবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বাবাসীর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। মানবজাতি পৃথিবীকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে মুষ্টিমেয় মুনাফাখোরদের অযৌক্তিক উন্নয়নের কাছে ছাড় দিতে আর রাজী নয়। পরিবেশবাদীদের দৌড় এত গড়িয়েছে যে, ধনবাদীদের লোভী হাত আজ আর কোনখানেই নিরাপদ নয়। জল-স্থলে-অন্তরীক্ষে তাদের কাজে কর্মের পেছনে ছায়ার ন্যায় ঘুরছে পরিবেশবাদীদের শ্যেনদৃষ্টি। ডিজিটেল আর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বদৌলতে তাদের দৃশ্য ঘরে বসেই অবলোকন করছি। বিশ্বে বিরল প্রাণী সংরক্ষণ, মূল্যবান গাছের জীবন রক্ষা থেকে শুরু করে পারমানবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে, ট্যাঙ্কার ফুটো থেকে বেড়িয়ে যাওয়া ক্রুডওয়েলের জন্য জলজপ্রাণী রক্ষার্থে, তিমি শিকারের বিরুদ্ধে পারমাণবিক ডুবোজাহাজের শুভেচ্ছা সফর ভন্ডুল করে দিচ্ছে ইত্যাদি উন্নত মিডিয়ার বদৌলতে পরিবেশবাদীদের সাথে আমরা একাত্ম হতে পারছি।

আজ হতে ৪০/৪৫ বছরের আগের দিনগুলিতে যদি আমরা ফিরে যাই তখনকার পৃথিবীকে মনে হবে কত গতিহীন এবং একঘেয়ে। ভৌগলিক দূরত্বকে আজকের ন্যায় বিজ্ঞান নিকট করতে পারেনি। উন্নত মিডিয়ার কারণে কোন অঞ্চলের ট্রাজেডি ঘটনাতে আমরা সহমর্মিতা জানানোর সুযোগ পাচ্ছি, একাত্ম হতে পারছি। অর্ধ-শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের অতীতে আজকের তুলনায় পৃথিবী অনেক বড় ছিল। এক অঞ্চলের সুখ-দুঃখের কাহিনী প্রচারের কোন উপায় ছিল না। ক্ষেত্র ও অঞ্চল ভেদে দুর্গম যাতায়াত এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কোন কোন এলাকাকে সত্যিই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হতো। কিন্তু তখনকার দিনেও মুনাফালোভীদের স্নায়ুহীন লোভী হাত প্রকৃতিকে, মানবজাতিকে কোন একটি জাতিসত্তাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গেছে। সে আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধ জুম্মদের জাতীয় জীবনে মরণফাঁদ।

দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও জুম্মদের পুরোমাত্রায় অন্ধকারে রেখে তদানিন্তন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করতে। চন্দ্রঘোনার পেপার মিল আর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুষ্টিমেয় কয়েক পরিবারের মুনাফার স্বার্থের জন্য কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র শঙ্খ নদীতেও হতে পারত। মূলতঃ এক দুরভিসন্ধি ছিল এ পরিকল্পনার মধ্যে। কেহ ধরতে না পারলেও দুনিয়া কাঁপানোর জন্য এক সূর্য সন্তানের জন্ম হয়েছিল ততদিনে। নিবীর্য ও হীনচেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘা বাঘা নেতা-নেতৃত্ব ছিল স্নায়ু উত্তেজনাহীন ও অথর্ব। উন্নয়নের নামে জ্বলজ্যান্ত এক মহাবিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে কোন বাদ কিংবা প্রতিবাদ তাদের মুখ থেকে টু-শব্দ উচ্চারণ হয়নি। কিন্তু তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। সেই চির তরুন সবার অলক্ষ্যে গর্জে উঠে জানালেন প্রতিবাদ। এ আলোকে লিখে ফেললেন পাকিস্তান সরকারের অন্যায় পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ এবং তা রদ করার জন্য লিফলেট বিলি করতে থাকেন জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে। ঘুম টুটে গেল নিবীর্য

নেতৃত্বের। হা-হুতাশ থেকে শুরু করে সাক্ষাৎ মরণ চিৎকার জুড়ে দিল তারা। শাসক-শোষকগোষ্ঠীর বিলাসী স্বপ্নের কাটা হয়ে সবার অলক্ষ্যে সে সুর্যসন্তানের 'খামোশ' শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী দেখল এবং বুঝতে পারল জুম্মজাতি বলবীর্যহীন নয়। যে পরিণতি দেখে আর্তচিৎকার জুড়ে দিয়েছিল তদানিন্তন জুম্ম নেতৃত্ব তা ঘটে গেল তরুন নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনে। কারাবরণ করলেন তিনি। জুম্ম জাতির জন্য প্রথম রাজনৈতিক জেল খাটা মানুষের কৃতিত্ব ও সৌভাগ্য বরণ করলেন তিনি।

তিনি বুঝেছিলেন কাপ্তাই বাঁধের বিদ্যুৎ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শিল্পপতির জন্য এবং তাদের ভোগবাদী জীবনকে প্রশস্ত করবে মাত্র। বাঁধ হল। সবদিক দিয়ে পশ্চাদপদ জুম্ম জাতি এবং তাদের আবহমান কালের শ্রম দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা ঐতিহ্য, শস্যভান্ডার, গ্রাম জনপদ কাপ্তাই জলরাশিতে তলিয়ে গেল। প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকা সরল সহজ জুম্ম জাতি অবাক বিস্ময়ে তাদের পরিণতির মর্মব্যথা অনুভব করে থাকে। তারা ভেবে পেল না কি তাদের অপরাধ! এরকম মানবিক বিপর্যয়ের জন্য জুম্মজাতি কোনদিন প্রস্তুত ছিল না। অনেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল জীবনের সব হারিয়ে। তরুন নেতা এম এন লারমার মনে পরিবেশ সচেতনতা ছিল বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা করেছিলেন এবং মানবিক বিপর্যয়ের জন্য সতর্ক করে দিতে গিয়ে অলক্ষ্যে হয়ে গেলেন অগ্রণী পরিবেশবাদী।

মহান নেতা মনে করতেন প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারাটা হচ্ছে এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া। এ গুণের অধিকারীর মধ্যে সভ্য ও বলদর্পী মানব সন্তানের চেয়ে প্রকৃতি সন্তানেরা অগ্রণী। কতিপয় মানুষের সীমাহীন লোভই হচ্ছে প্রকৃতিতে বৈরী পরিবেশ সৃষ্টির মূল কারণ। মহান নেতা এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সংবেদনশীল ছিলেন। ভারসাম্যপূর্ণ জীবন মানুষ ও প্রকৃতি একে অপরের জন্য হয়ে উঠে সম্পদ ও আশ্রয়। এ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। বাড়াবাড়ি সকল সময়ই খারাপ। বিশেষতঃ অধিকার হারা জাতির জন্য প্রকৃতি একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে বিশ্বস্থতার সাথে। তিনি এ নীতিতে এত অটল ছিলেন যে, গেরিলা জীবনে অহেতুক সামান্য একটি বাঁশও কাটতে দিতেন না। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পাহাড়ময় অথচ চিরহরিৎ ঝোপঝাড় গাছ ও বাঁশে পরিপূর্ণ। এখানে বসবাসকারী জুমচাষীরা বনজঙ্গলকে মনে করে জীবনের অংশ। পৌষ মাঘ মাসে একটা সুবিধামত ও পছন্দের জায়গাকে বেছে নিয়ে ওখানকার জঙ্গল কেটে ফেলে তবে বড় বৃক্ষকে নয়। রোদ্রে শুকাতে দেয় ফাগুন ও চৈত্র মাসে। বৈশাখ মাসে ধুম পড়ে যায় কর্তিত অংশতে যা আছে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করার। তার আগে তারা বাকী প্রকৃতিকে নিরাপদ করতে জুমের স্থানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে কাঁচা ঝোপঝাড় থেকে। এটাকে চাকমারা 'ডাঙা কাজা' বলে। মহান নেতা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জুমের আগুন যেন দাবানলে পরিণত হয়ে পরিবেশের ক্ষতির কারণ না হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সচেতনতা বাড়াতে জুম চাষিদেরকে 'জুমচাষী সমিতি' তে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

চিরহরিৎ বনবাঁদাড়ের অন্তরালে অসংখ্য ছোট ছোট ঝর্ণা, হ্রদ, ঝিরি ও নদীতে পরিপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ সবখানে জলজসম্পদ মৎস্য, কাঁকড়া, ইছা অঢেলভাবে পাওয়া যায়। প্রয়োজনের অধিক ধৃত জীবন্ত মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি ছেড়ে দিতেন তিনি। তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন করেন এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ইহার প্রচার করান। হত্যার নিষিদ্ধ তালিকায় বাঘ, হরিণ, পাহাড়ী কচ্ছপ, অজগর, বাদিহাঁস, ঢংরাং (ধনেশ পাখী), বার্গী, গন্ডার (বাস্তবে নেই), অতিথি পাখী ইত্যাদি। একবার কোন এক গোপন আস্তানায় তাঁর শয়নকক্ষে দুটো প্রাণী থাকত। নীচে মহান নেতা ওপরের ছাদে বাঁশের খোপে এক বিষধর কোবরা। তিনি নির্ভয়ে সহাবস্থান চালিয়ে যান সেখানে যতদিন ছিলেন। মহান নেতার এহেন গুণাবলী আজকের পরিবেশ সচেতনতার যুগে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। এ প্রেক্ষাপটে আজ বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বলা যায় বাংলাদেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের চুড়ান্ত সীমায় এসে গেছে। এত অনিয়ম, এত দুষণ, এত দূর্নীতি, এত ভারসাম্যহীন পরিবেশ ভাবা যায় না!

বাংলাদেশের জলবায়ুর যে রহস্যময়ী আচরণ তা কিন্তু আজকালকার সমস্যা নয়। বহু বৎসর যাবৎ অবাধ বন ধ্বংসকরণ ও অন্যান্য অনৈতিক ও অপরিণামদর্শী কাজের মাধ্যমে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে প্রকৃতির উপর। আর সবখানেই আছে শোষক ও মুনাফাখোরগোষ্ঠীর কালো হাত। অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন, পাহাড় কাটা, পাখি নিধন, চর দখল, নদী দখল, রাস্তা দখল, প্রবীন ও সুশোভন বৃক্ষরাজি নিধন, জলাশয়, হ্রদ দখল। প্রকৃতির কোন ফ্রন্টই আজ থাবামুক্ত নয়। ফলতঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত আর প্রকৃতির চরিত্র হয়ে উঠেছে আরও হিংস্র। অকাল বন্যা, খরা, মংগা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙন ইত্যাদি আজ বাংলাদেশের নিত্য সঙ্গী। ছিন্নমূল মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। আর সেসব লোকদের সরকারীভাবে পুনর্বাসনের নামে বিবিধ প্রকল্পের নামে কেড়ে নেয়া হচ্ছে সংখ্যালঘু, আদি ও স্থায়ী বাসিন্দাদের ভুমি, সম্পত্তি। পর্যটন শিল্প উন্নয়নের নাম দিয়ে ইকো পার্ক প্রকল্পের মারফত আদিবাসীদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গাছ ও বনজসম্পদ লুন্ঠন চলছে। আর এ সব সম্পদের মুনাফার পাহাড় দিন দিন স্ফীত হচ্ছে মুষ্টিমেয় মুনাফাখোরদের ব্যাংক ব্যালান্স।

বাংলাদেশের অপরাপর অংশের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। বাংলাদেশের কায়েমী শাসক ও শোষকগোষ্ঠী অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখানকার বনজসম্পদ ধ্বংসকরণ এবং জুম্ম উৎখাত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে চরম অনৈতিক পন্থা কার্যকরী করতে যাচ্ছে। এখানকার দুর্নীতিবাজ ও ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক আমলা, শাসকদলীয় সুবিধাবাদী ও চরম জুম্ম

বিদ্বেষী লোকজন এবং বহিরাগত বাঙালী, ভিখারী থেকে বিত্তশালী হওয়া নব্য ধনী এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরের বসবাসরত কালো টাকার মালিক এবং উগ্র মৌলবাদী শক্তি মিলে একযোগে জুম্ম জাতি ধ্বংসকরণ তান্ডব চালাচ্ছে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সবক্ষেত্রে জুম্ম জাতি আক্রান্ত। রাশি রাশি বনজসম্পদ পাচার হচ্ছে। হাজার হাজার একর জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সুকৌশলে এসব স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন হাজার হাজার সেনাবাহিনী তাদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করছে। যে সেনাবাহিনী দিন রাত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে টহল দেয়, চেকপোষ্ট বসায়। তাদের সতর্ক চোখ এবং কানকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাছিও পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়া আসা করতে পারেনা। অথচ পাচারের উদ্দেশ্যে মূল্যবান সেগুন ও অন্যান্য গাছে ভর্তি বড় বড় ট্রাক বহর আর্তচিৎকার করে করে তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। অথচ তারা দেখেন না। এখানে একটা কথা প্রায়ই বলাবলি হয়- পাচারকারীরা নাকি প্রশাসনকে পার্সেন্টিজ দিয়ে বশ করায়। বন বিভাগ, সাংবাদিক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আমলারা নাকি ঐ পার্সেন্টিজ ভাগ পায়। দুর্মুখেরা এমপি, মন্ত্রীদেরও জড়ায়। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদের বখরা প্রাপ্তরা কিংবা বিলাইছড়ি ফারোয়া ও কাপ্তাই অঞ্চলের সরকারী সেগুন বাগানের প্রত্যেকটি গাছ থেকে পার্সেন্টিজভোগীরা ঐ মুনাফাখোরদের সেবাদাস। আর এসব সেবাদাসদের হাতে প্রশাসনের কলকাঠি ধরা। মাঝে মাঝে তারা নাটক করে- তামাশা বিলায়। এমনকি তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে জীবন পর্যন্ত কেড়ে নেয় তথাকথিত কাঠচোর, কাঠপাচারকারীদের। ঘটনা যদি সত্যি হয় এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী হিসেবে জীবনে ২/১ টা গাছ হয়ত সে চুরি করেছে, তার মূল্য হতে পারে কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু কোটি কোটি টাকার গাছ চোরদের টিকিটি ধরার কি মুরোদ আছে এসমস্ত সেবাদাসদের?

মুনাফাখোরদের কাছে যে দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারও অসহায় সেখানে 'মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট'রা কি করতে পারে! তবে তারাও অবশ্যই পারে। সরকার, মন্ত্রী, আমলা সবাই একটা কাজ করতে পারে। আর তা হচ্ছে- ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে যে, শাসক ও শোষকগোষ্ঠী একত্রে মিলেমিশে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পদানত করে তাদেরকে শাসন ও শোষণে নিষ্পেষিত করতে পারে। প্রয়োজনের খাতিরে সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রশংসা, স্তুতি করে মাথার উপর তুলতে যেমনি ওস্তাদ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ন্যায় গালমন্দ থেকে শুরু করে দূরে নিক্ষেপ করতেও বাঁধেনা তাদের। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মুক্তিকামী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে সশস্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিতে সই করার পর কয়েকদফা অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে তার সেই সশস্ত্র সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তার অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়ে গেল বিলুপ্ত সেই শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা-কেচ্ছা কাহিনী। এমনই দেখা গেছে, বাজার মন্দা কোন দৈনিক পত্রিকায় শান্তিবাহিনী সম্পর্কে মনগড়া কিছু কেচ্ছা কাহিনী ঢুকিয়ে দিলে বাজার মাত। এ থেকে কি ইহা প্রমাণিত নয় শাসক-শোসকগোষ্ঠীর নিকট শান্তিবাহিনী কি পরিমাণ ভীতিকর এবং ত্রাস আর নির্যাতিত নিপীড়িতদের নিকট কি পরিমাণ ভরসার স্থল। কিছুদিন আগে ইহার অভিব্যক্তি আবার ধ্বনিত হল। কথায় বলে চোরের মার বড় গলা। সম্প্রতি শান্তিবাহিনীর আবার তলব হল। তবে এবার কাঠ পাচারকারী হিসেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজসম্পদ, সেগুন, অন্যান্য মূল্যবান গাছ পাচারকারী শান্তিবাহিনী। শান্তিবাহিনী আগে যুদ্ধ করত, তাই ক্যাম্প ও সেনাবাহিনী মোতায়ন করতে হয়েছে সার্বভৌম রক্ষার্থে। এবার ক্যাম্প বাড়াতে হবে কাঠপাচারকারী শান্তিবাহিনী ও কতিপয় বাঙালী পাচারকারী ঠেকাতে তাও আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংশোধন করে। সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র এদেশের শাসক ও শোষকগোষ্ঠী এবং তাদের কান্ডকীর্তি!

ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনা। কিন্তু সুন্দর প্রকৃতি প্রেমিকের সচেতনতা। পরিবেশ রক্ষার্থে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী কি রকম মরিয়া তার কি জলন্ত নজির হচ্ছে। যখন আমরা দেখি গারোদের পানপুঞ্জি আজ আক্রান্ত। তথাকথিত ইকোপার্ক মোড়কে বংশ পরম্পরায় খাসি-গারোদের জীবন জীবিকার বান্ধব কয়েক হাজার বৃক্ষ নিধন করে লোভ চরিতার্থ করার এবং কৌশলে গারোদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্র। নির্বিচার বনজ সম্পদ পাচারের ফলে চিরহরিৎ পার্বত্য চট্টগ্রামকে করে তোলা হচ্ছে মরুভূমিতে পরিণত। অতীতে বৃষ্টির ঢল নামলে পানির রং হতো লাল কিংবা কালচে। ঝড়ে পড়া পাতা ও অন্যান্য গুল্মের পচা মিশ্রিত পানিতে মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ থাকত খুব সামান্য। আজ সে অবস্থা পাল্টে গেছে, বৃষ্টির ঢলে আজ নেমে আসে হাজার হাজার টন ক্ষয় হয়ে যাওয়া মাটি। ফলতঃ কাপ্তাই লেক মুহুর্মুহু করে ভরাট হয়ে চলেছে। সামান্য বৃষ্টিতে হ্রদের পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে, কাপ্তাই বাঁধ এবং এখানকার বাসিন্দারা আজ ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশের পরিবেশের এহেন পরিণতিতে আজ সঙ্গত কারণেই মহান নেতার কথা মনে পড়ে। জানিনা তিনি আজ কি পরিমাণ ব্যথিত হতেন। যে দেশ এবং মাটির জন্য তিনি উৎসর্গীত হয়েছেন, যে প্রকৃতিকে তিনি জীবনেরই অপরিহার্য মনে করতেন, ভালবাসতেন সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত। #

এম এন লারমার আদর্শ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

শক্তিপদ ত্রিপুরা

এম এন লারমা কি চেয়েছিলেন? এম এন লারমা চেয়েছিলেন জুম্ম জনগণের মুক্তি। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের শাসন-শোষণ হতে জুম্ম জনগণের মুক্তি। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ শাসন-শোষণ হতে মুক্ত হতে পারে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুক্ত হতে পারে। এম এন লারমা চেয়েছিলেন শাসন-শোষণ হতে মেহনতি মানুষের মুক্তি। তিনি যে মেহনতি মানুষের মুক্তি চান তা তাঁর চিন্তায়, কথায় এবং কর্মে প্রতিফলিত। এ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় জাতীয় সংসদে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায়, পাবত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে। তিনি যে জুম্ম জনগণকে কতটা ভালবাসতেন আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। সত্যিকার অর্থে তিনিই দশ ভাষা-ভাষি জুম্ম জনগণের নেতা। তিনিই সত্যিকার মেহনতি মানুষের নেতা।

বৃটিশপূর্ব ও পরবর্তীকালে মেহনতি মানুষের উপর সামন্তপ্রভূ ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের অথনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষন, পাকিস্তান আমলে জুম্ম জনগনের অধিকার হরণ এবং জুম্ম জনগণের অথনৈতিক কাঠামোর উপর কষাঘাত ও রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ সরকারের শোষণ, নিপীড়ন এম এন লারমার রাজনৈতিক চিন্তাকে পুষ্ট করে তুলছিল। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন আন্দোলন ব্যতীত জুম্ম জনগণের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষাসহ জুম্মদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনেতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবে সম্ভব নয়। তিনি অনুভব করলেন আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সংগঠন। তাই তিনি ১৯৭২ সালে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রামের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষা-ভাষি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এম এন লারমার চিন্তা ও নেতৃত্ব বাস্তবসম্মত ছিল বলেই তাঁর সংগঠন জনগণের সংগঠনে পরিণত হতে পেরেছিল; চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত শত্রুকে অন্ধকারে রেখে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। একজন চিন্তা-বিদ হিসাবে, একজন নেতা হিসাবে, একজন সংগঠক হিসাবে এখানেই তাঁর সাফল্য।

সত্যিই তিনি একজন চৌকষ ও বিচক্ষণ নেতা ছিলেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তিনি সংগঠনকে সেভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সে কারণে তিনি একজন দূরদর্শী নেতাও বটে। ৭৫ এর পট পরিবর্তন, বাংলাদেশের সামরিক শাসন তাঁর চিন্তা, উদ্যোগ ও সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। তিনি শত শত, হাজার হাজার ত্যাগী ও সাহসী কর্মী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কত বড় মাপের একজন সংগঠক হলে পরে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনীতিতে অনগ্রসর, ভিন্ন ভাষাভাষি জনগণের কর্মীবাহিনীকে তিনি সুশিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এখানে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও নৈপূণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এম এন লারমার সৈনিক প্রসঙ্গে

আমরা যারা জনসংহতি সমিতি বা পার্টির সহযোগী সংগঠনের কর্মী হিসাবে কাজ করি, আমরা যারা প্রগতিশীল আদর্শকে লালন করি, আমরা যারা মেহনতি মানুষের পক্ষে, আমরা এম এন লারমার সৈনিক মনে করি। আমরা তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর মত ও পথকে সঠিক বলে মনে করি। সেজন্যই আমরা তাঁর সৈনিক। কিন্তু জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সত্যিকার অর্থে আমরা এম এন লারমার চিন্তাধারা, তাঁর মত ও পথকে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে, আন্দোলনের প্রতিটি কর্মে কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি?

আমরা লারমার সৈনিকরা এম এন লারমার সংগ্রামী চেতনা, সংগ্রামী জীবন, তার মিতব্যয়িতা, বিনয়, তাঁর সহজ সরল জীবন, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা, জীবপ্রেম, তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, তাঁর ক্ষমা গুণ, তাঁর অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের নৈপুন্যতা, কৃষক-শ্রমিক মেহনতি-গরীব মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দুরদর্শিতা, সাংগঠনিক সততা আমরা কতটুকু শিখতে পেরেছি?

এম এন লারমার চিন্তা চেতনাকে আমরা ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে এবং সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তে আমরা কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি? সময় এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার- এম এন লারমার প্রত্যেকটি সৈনিককে। আমাদের প্রত্যেকের বাস্তব জীবনের প্রতিটি কাজের সাথে এম এন লারমার নির্দেশিত পথ, মত ও তাঁর চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না ভেবে দেখা দরকার। ভেবে দেখা দরকার আমরা এম এন লারমার সৈনিক হয়ে তাঁর চিন্তাধারার বিপরীতে কাজ করছি কিনা, তাঁর সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছি কিনা? আমরা জুম্ম জনগণের পক্ষে, মেহনতি মানুষের পক্ষে কাজ করছি কি-না? নাকি আমরা জনগণের সম্পদ, মেহনতি মানুষের

সম্পদ হরণ করছি। নাকি জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার, তাদের রাজনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপরীতে কাজ করছি? আমাদের প্রত্যেক কাজের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এসেছে। আমরা যদি এম এন লারমার চিন্তাধারাকে ধারন না করি, আমরা যদি এম এন লারমার মত ও পথে অগ্রসর না হই/ না চলি, আমরা যদি এম এন লারমা যে আদর্শ বিশ্বাস করতেন সে আদর্শ বাস্তবায়নে সক্রিয় না হই, তাহলে আমরা এম এন লামার সৈনিক হবো না, হতে পারবো না। আমরা যদি এম এন লারমার চিন্তাধারাকে ধারণ করতে না পারি, তাঁর মত ও পথে অগ্রসর না হই, আমরা যদি জুম্ম জনগণের পক্ষে, মেহনতি মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আমরা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারবো না।

আমরা যদি এম এন লারমার সংগ্রামী চেতনা, ত্যাগী মানসিকতা, সংগ্রামী জীবন ও প্রগতিশীল আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের পার্টিকে একটি শক্তিশালী পার্টি সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পারবো না। এম এন লারমা এই আদর্শ, এই চিন্তা-ধারা, মত ও পথের ভিত্তিতে জনসংহতি সমিতিকে মহাশক্তিধর সংগঠনে রূপান্তরিত করেছিলেন, যে মহাশক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। সংলাপের মধ্য দিয়ে চুক্তিতে উপনীত করতে বাধ্য করেছিলেন। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের পার্টিকে মহাশক্তিরূপ ধারণ করতে হবে এবং এম এন লারমার প্রদর্শিত মত ও পথে তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই কেবল মহাশক্তিসম্পন্ন পার্টি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

জনগণের নেতা প্রসঙ্গে

এম এন লারমা সত্যিকার অর্থে জনগণের নেতা ছিলেন। তিনি যেমনি সর্বদা জনগণের জন্য চিন্তা করতেন, তেমনি তাঁর প্রতিটি কাজে তাঁর চিন্তা প্রতিফলিত হতো। জনগণের জন্য চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে তিনি জনগণ হতে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন থাকতেন না। তাই ক্ষেতমজুর, জুমচাষী, শ্রমিক হতে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সকল শ্রেণী সত্যিকার অর্থে তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাদের নেতা মনে করতেন। কিন্তু আজ আমরা তাঁর অনুসারীরা তাঁর এই চিন্তা কে কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি? আমরা সত্যিকার অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেহনতি মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি? আমরা কি এই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই মেহনতি মানুষের জন্য তাদের অর্থনৈতিক অধিকার, তাদের সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা কে কতটুকু ভূমিকা পালন করে চলেছি? মনে রাখা দরকার, এই জুমচাষী, এই ক্ষেতমজুর শ্রেণী, এই গ্রামীন মানুষেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অতীত ও বর্তমানের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেও তাদের অবদান কম নয়। সুতরাং লারমার সৈনিকদের সাধারণ জনগণের ভূমিকাকে ভুলে যাওয়া কোনভাবেই উচিত নয়। তাই লারমার অনুসারী হিসাবে পার্টি কর্মীদের জনগণের এই অবদান কোনভাবেই অস্বীকার করা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। পার্টির ক্ষমতা, যোগ্যতা জনগণের মাঝ হতে উচ্চারিত হবে, সঞ্চারিত হবে। আমরা জানি যে, চুড়ান্তভাবে জনগণই আন্দোলন করে। সুতরাং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই জনগণই আন্দোলন করবে। সুতরাং তাদেরকে অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা, বঞ্চিত করা, দূরে ঠেলে দেয়া বা তাদেরকে কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অর্থই হলো জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও এম এন লারমার চিন্তা, মত ও পথের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সুতরাং আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য, আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করার জন্য জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টিকে, পার্টির প্রতিটি কর্মীকে এক মূহূর্তের জন্য হলেও তাঁর চিন্তা ও কর্ম হতে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। এতে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, কেন্দ্র বা সহযোগী সংগঠনের সকল কর্মীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকল ইউনিটের কর্মীরা যদি জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন না হই, আমরা যদি জনগণের সুখে-দুঃখে জনগণের সাথে থাকি, আমরা যদি জনগণের ক্ষতি না করি বরং সহযোগিতা করি তাহলে আমার বিশ্বাস এই সংগঠন ইস্পাত কঠিন মহাশক্তিধর সংগঠনে পরিণত হবে। যে সংগঠনকে অতীতের মতো পরাস্ত করা পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই এবারের ১০ই নভেম্বরের শপথ এই হোক- আমরা লারমার সৈনিকরা এক মুহূর্তের জন্যও জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হবো না, (সর্বদা ব্যক্তি স্বার্থকে জনগণের স্বার্থে) জনগণের সামনে পার্টির স্বার্থে প্রয়োজনে নিজের জীবনদানে দ্বিধা বোধ করবো না, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লারমার ন্যায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে যাবো- এই হোক সকলের শপথ। এই শপথ যদি আমরা প্রত্যেকেই নিতে পারি, এই শপথ বাস্ত বায়নের জন্য আমরা যদি সকলেই এম এন লারমার ন্যায় আত্মবলিদানে প্রস্তুত হতে পারি তাহলে আমাদের সংগঠন ইস্পাত কঠিন মহাশক্তিধর সংগঠনে রূপ লাভ করবে এবং এই সংগঠনকে পরাস্ত করা পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব হবে না। এভাবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার একদিন সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকার অর্থে জনগণের অধিকার, মেহনতি মানুষের অধিকার। জয় হোক জুম্ম জনগণের।

এম এন লারমার চিন্তার প্রতিটি দিককে আমরা যদি আমাদের কর্মে প্রতিফলিত করতে পারি তবেই তাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। মেহনতি মানুষ ও জুম্ম জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু এম এন লারমা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এম এন লারমা যেমনি মেহনতি মানুষের, জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার চিন্তা করতেন তেমনি তাঁর বক্তব্যে ও কাজে এ চিন্তা বাস্তবায়নের জন্য সারা জীবন সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতায় ভরপুর ছিলেন। তিনি একজন পরিশ্রমী ও কর্মবীর ছিলেন। সুতরাং এম এন লারমাকে চিনতে হলে তার চিন্তা ও কর্মকে এক সাথে দেখতে হবে। এম এন লারমাকে চিনতে হলে তার জীবনের সমস্ত দিককে দেখতে হবে। অখন্ডভাবে না দেখে খন্ডভাবে দেখা হলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে চেনা যাবে না।

এম এন লারমাকে চিনতে পারেনি বলে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এম এন লারমাকে ভুল বুঝেছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এম এন লারমার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ছিল সঠিক ও বাস্তব সম্মত। এই জাতীয় বেঈমানরা সেদিন (১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর) জুম্ম জনগণের মুক্তিপথের দ্রষ্টা, জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু এম এন লারমার চিন্তা, তাঁর মত ও পথ সঠিক ছিল বলে আজ তা প্রমাণিত। তাঁর চিন্তার আলোকে তাঁর প্রদর্শিত পথে আন্দোলন এগিয়ে চলেছে বলেই জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে চলেছে। কিন্তু সেদিন গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র কিছু দিনের জন্য হলেও জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং জুম্ম জনগণের পথের দিশারী জাতীয় নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করে জুম্ম জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করল। এই ক্ষতির জন্য জাতি তাদের ক্ষমা করতে পারে না। এটা ক্ষমাহীন অপরাধ।

সত্যের জয় অনন্তকাল। এই বিভেদপন্থীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল এবং অবাস্তব ও ভুল চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। সে অবাস্তব চিন্তা সে মিথ্যা কালান্তরে প্রমাণিত হল। জনগণের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার ভাবে ভেসে উঠল। বিভেদপন্থীরা সত্যিকারভাবে ভুল চিন্তাধারায় আবর্তিত এবং ভুল পথে পরিচালিত হয়ে সংগঠনকে, জাতিকে দ্বিখন্ডিত করে আন্দোলন সংগ্রামকে ধ্বংস করেছে। অতঃপর জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেয়ে বিভেদপন্থীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

বিভেদপন্থীদের প্রেতাত্মা প্রসিত চক্র

এ পর্যায়ে এসে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের প্রেতাত্মা আবার জেগে উঠে। যুগে যুগে সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায়ও আমরা তাই দেখতে পায়। যারা এতদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীনে কাজ করেছিলেন সেই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও গণপরিষদের একাংশ প্রসিত চক্র এম এন লারমার চিন্তা, তাঁর প্রদর্শিত মত ও পথের অনুসারীর ভান করেছিল। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে এই প্রসিত চক্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এম এন লারমার চিন্তাধারা ও তাঁর মত ও পথ হতে ছিটকে পড়ল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নেতৃত্বকে না মেনে ইউপিডিএফ গঠন করার পরও প্রসিত চক্র প্রথম প্রথম এম এন লারমার মৃত্যু দিবস পালন করতো। কিন্তু এখন আর তারা এম এন লারমার মৃত্যু দিবস পালন করে না। তার অর্থ এই যে, এম এন লারমা ও তাঁর চিন্তাধারা তাদের লেশ মাত্র নেই। এখন বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের প্রেতাত্মা তাদের কাঁধে ভর করেছে এবং বিভেদপন্থীদের চিন্তাধারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে।

তারা আজ এম এন লারমার মৃত্যু দিবস পালন করছে না। বরং জীবনের বিনিময়ে গড়ে তোলা এম এন লারমার আন্দোলন ও তাঁর সংগঠন জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার কাজে অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা বিভেদপন্থীদের ন্যায় সুন্দর সুন্দর মিথ্যা কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তবে একথা মনে রাখা উচিত জনগণ কখনো বোকা নয়। জনগণের বিবেক এক সময় জাগ্রত হয় এবং একদিন জনগণ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব নির্ধারণ করে দেয়। যেমনটি হয়েছিল টিপিপি ও বিভেদপন্থীদের সাথে জনসংহতি সমিতির জয়-পরাজয় নির্ধারণে। সুন্দর সুন্দর মিথ্যা কথা বলে জনগণকে কিছু দিনের জন্য বিভ্রান্ত করা যায়, সব সময়ের জন্য কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং জুম্ম জনগণের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হচ্ছে প্রসিতচক্র আসলে কি চায়, কাদের পক্ষ হয়ে, কাদের স্বার্থে তিনি তথাকথিত আন্দোলন করছে। কাদের স্বার্থে তারা এম এন লারমার তিলে তিলে গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠা সংগঠন জনসংহতি সমিতিকে আঘাত হেনে চলেছে? এ সব আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হচ্ছে।

জনসংহতির সমিতির অর্জিত অধিকার ও আন্দোলন জনগণের আন্দোলনেই অর্জিত অধিকার এবং এ পর্যায়ের বিকশিত আন্দোলন জনসংহতি সমিতি ও জনগণের যৌথ আন্দোলনের ফসল। সুতরাং জুম্ম জনগণ ও তার নেতৃত্বদানকারী সংগঠন জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এ পর্যায়ের আন্দোলনকে শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতির চুক্তি ও জনসংহতির একার আন্দোলন ভাবলে ভুল হবে। এ আন্দোলন ও চুক্তি এক সাথে জুম্ম জনগণের এবং জুম্ম জনগণকে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন জনসংহতি সমিতির। সুতরাং প্রসিত চক্রদের মনে রাখা উচিত - পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির বর্তমান পর্যায়ের আন্দোলন অস্বীকার, বিরোধীতা ও অবমাননা করার অর্থ হল এম এন লারমা, জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণকে এবং তাদের আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তকে অস্বীকার করা, বিরোধীতা করা ও অবমাননা করার সামিল। সুতরাং এখনও সময় আছে জনগণের আন্দোলনে সামিল হবার । #

গৃহযুদ্ধ ও প্রয়াত নেতার স্মরণে

আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক

১৯৮৩ সনের ১৪ই জুন আনুমানিক সকাল ৯ টা কি ১০ টার মধ্যে বিশেষ সেক্টরে যুদ্ধ হয়। বিভেদপন্থীরাই যুদ্ধটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। অথচ আমাদের পক্ষ সমঝোতা করার জন্যই বিশেষ সেক্টরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু বিভেদপন্থীদের মনের মধ্যে খারাপ ধারণা ছিল। একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে অতর্কিতে তারা আমাদের পক্ষের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। তবে আমাদের পক্ষকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি তারা। কিন্তু জুম্ম জনগণের জন্য সুদুর প্রসারী এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সৃষ্টি করে তারা। আর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে রামবাবুর নেতৃত্বে যে গ্রুপটি এসেছিল সে গ্রুপটি দক্ষিণে চলে না গিয়ে একটি ক্ষুদ্র অংশে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এসময় উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন এবং আমাদের নেতৃত্ব দেন রূপায়ন দেওয়ান ওরফে রিপ। তিনি কোথায় কোথায় বিভেদপন্থীদের আস্তানা আছে এবং তারা কোথায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুকিয়ে রেখেছিলো তার অনুসন্ধান চালান। তিনি সুকৌশলে বিভেদপন্থীদের কমান্ডার পলাশ ও বাকী কমান্ডারদের বোকা বানিয়ে দুইটা নতুন কারবাইন বের করে নিয়ে আসেন। রামের গ্রুপের সাথে এক আলোচনায় রূপায়ন দেওয়ান প্রশ্নের সুরে বলেন, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের কি করা দরকার? সেময় উপস্থিত ছিলেন রামবাবুসহ আরও তিন কম্যান্ডার পেলে, দেবাশীষ, ঈশ্বরবাবু। তাঁরা বলেন যে, অবশ্যই অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বের করতে হবে। কিন্তু তার আগে বিভেদপন্থীরা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং যেখানে গোলাবারুদ ও অস্ত্রভান্ডার লুকানো ছিল সেগুলো তারা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে।

এরপরও প্রয়াত নেতার নেতৃত্বে আমাদের পক্ষ নানাভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু দিন দিন সে প্রচেষ্টা কঠিন হয়ে উঠে। বিভেদপন্থীদের আচরণ ও কার্যকলাপ বিপদজনক মাত্রায় চলে যায়। তখন নিয়মতান্ত্রিক উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করতে হয়। একসময় আমাদের পক্ষ সুকৌশলে বিভেদপন্থীদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্রভান্ডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তখনকার সময় উদ্ধারকৃত অস্ত্র গোলাবারুদ জনসাধারণের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের এলাকায় আনা হয়। তখন আমাদের পার্টির যে এত শক্তি আছে এবং তা যে জনগণের পার্টি তা প্রকাশ পায়। অপরদিকে জনগণ ভাবতে থাকে বিভেদপন্থীরা ক্ষমতার জন্যই লড়াই করছে। জনগণের কাছে তাদের মুখোশ খুলে যেতে থাকে। সে সময় রূপায়ন দেওয়ান ওরফে রিপ দীঘিনালা জোনে ফিল্ডের দায়িত্বে ছিলেন এবং আমি জোন কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলাম। তিনি আমাকে চিঠি লেখেন দুই শতের অধিক লোক জোন থেকে পাঠাতে হবে। তখন আমি দুই শতের অধিক লোক পাঠালাম বিভেদপন্থীদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনার জন্য। জনগণ উক্ত গোলা-বারুদ আনার পর বিভেদপন্থী চক্রদেরকে গালিগালাজ দিতে শুরু করলো ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী ইত্যাদি বলে। উল্লেখ্য যে, ১৪ জুনের আগে আমাকে আমার জোনের সহকারী কমান্ডার দীপকের মাধ্যমে চক্র গ্রুপের পলাশ খবর দিয়েছিল আমি যাতে বিশেষ সেক্টর সহকারী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু আমি দীপকের মাধ্যমে সরাসরি খবর পাঠালাম যে, 'বিশেষ সেক্টর সহকারী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা আমার নেই। কারণ আমি সবেমাত্র ডি-জোনের দায়িত্ব নিলাম।' আমার চেয়ে যোগ্যতর কমান্ডার থাকা সত্বেও আমাকে বিশেষ সেক্টর সহকারী কমান্ডার এর দায়িত্ব পালণ করতে বলেছিল বস্তুতঃ আমাকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তার দলে টানার জন্য। কিন্তু আমি সত্যটা বুঝে কৌশলে পার্টির পক্ষাবলম্বন করলাম। তবে ডি-জোনের কর্মীরা প্রায় আঞ্চলিক কর্মী এবং ডি-জোনের সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ বলে ধরা যায়। কতিপয় কর্মী বিভেদপন্থীদেরকে সহযোগিতা দিয়ে যেতো। এবং ১৯৮৩ সনে ১৪ই জুন এর ঘটনার পর বিভেদপন্থীদের হাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ এর সংখ্যা অধিকাংশই তাদের হেফাজতে ছিল। আমাদের আদর্শ ও দৃঢ়তা এবং আত্মনির্ভরশীলতা ছিল বলে আমরা জয় করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রয়াত নেতা লারমা জাতীয় স্বার্থে সমঝোতার লক্ষ্যে তাঁর মহান নীতি 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া নীতি' গ্রহণ করলেও ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সনে নৃশংসভাবে বিভেদপন্থীদের হাতে শহীদ হন।

সে সময় বর্তমান নেতা সন্তু লারমা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, 'আমি জীবিত আছি, খুব দুঃখের সাথে লিখতে হচ্ছে আমাদের নেতা এন এন লারমাকে বিভেদপন্থীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমি কোনমতে বেঁচে গেছি।' তখনকার সময় ডি-জোনের বিভেদপন্থী দুইজন আমাদের হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলো। বর্তমান নেতা সন্তু লারমা ঐ চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন বন্দী দুইজন বিভেদপন্থীকে ছেড়ে দিতে। তখন ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমান নেতা বলেন, হ্যাঁ, রাজনীতি ও বিপ্লব করছি, কতকিছু হয়ে যাবে। রাজনীতি কোন ভোজসভা নয়, অনুশীলন নয়, রাজনীতি হল নিষ্ঠুর, কঠিন এবং বলপ্রয়োগের বিষয়।

প্রয়াত নেতা শহীদ হওয়ার পর জনগণের আরও ভুল ভেঙে গেল। সত্যিই ক্ষমতার লড়াই চলছে। পার্টি সদস্যদের আত্মবিশ্বাস এসে যায় যে পার্টি সঠিক পথে আছে। সঠিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে। তখন জনগণের আস্থা ও সংগঠন আমাদের দিকে ফিরে আসে। বিভেদপন্থীরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলো না। বর্তমান নেতা সন্তু

লারমা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার কারণে স্বল্প সময়ে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং তার সহকর্মীদেরকে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তাড়াহুড়োতে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে এসে যায়।

তখনকার সময়ে উষাতন তালুকদার ফিল্ডে ছিলেন এবং তার কাছাকাছি ছিলেন চন্দ্রশেখর চাকমা তাপস। সে সময় যারা সিনিয়র বা কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ছিলেন তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ফিল্ডে কাজ চালিয়ে যায়। বিভেদপন্থীদের বাদে আমাদের পক্ষের উপর কোন পরশ্রীকাতরতা ছিল না। সবসময় মনে পড়ে আমরা জয় করতে না পারলে আমাদেরকে শেষ করবে এই ভাবনা নিয়ে কাজ করছিলাম। সুতরাং বর্তমান সময়েও জেএসএস কর্মীদের মনে রাখা উচিত যে, চুক্তি বিরোধীরা যদি অস্ত্র সমর্পন না করে তাহলে আমাদের জুম্ম জাতিকে অবশ্যই ধ্বংস করবে। এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, চুক্তি বিরোধীদেরকে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পর্দার অন্তরালে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের এখন করণীয় হচ্ছে চুক্তিবিরোধীদেরকে যে কোন উপায়ে হোক নিষ্ক্রিয় করা। চুক্তি বিরোধীরা যদি না থাকতো এতদিন চুক্তি বাস্তবায়ন এর প্রক্রিয়া আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতো। তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সুযোগ নিয়ে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে যেমনি গড়িমসি করছে তেমনি নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমরা দেখছি যে, সরকার কৌশলে প্রতিদিন এক পরিবার দুই পরিবার করে অনুপ্রবেশকারী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকাচ্ছে এবং আমাদের জুম্মদের জায়গা জমি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে এবং পদক্ষেপ নিতে হবে কিভাবে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতি এর সাথে মাঝে মাঝে বৈঠক করে শুধু মাত্র কালক্ষেপনই করছে। আমাদের বুঝতে হবে যে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার জায়গায় জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে খালি জায়গাগুলো দখল করে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করবে এবং করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কাল ১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি, দীঘিনালা, বড়মেরুং এবং ১৯ই ডিসেম্বর পানছড়ি কালানালে জুম্মদের উপর সংঘটিত গণহত্যা থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালে ১৭ই নভেম্বর নানিয়াচরে গণহত্যা এবং সর্বশেষ ২৬শে আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলা পর্যন্ত এই বাস্তবতায়ই বারবার প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া নারী ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগ, বিনাকারণে গ্রেফতার ইত্যাদি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার কথা বাদই দিলাম। আমরা দেখি এই সব ঘটনার বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এম এন লারমার গড়ে তোলা পার্টি বর্তমান নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্টি জনসংহতি সমিতিই একমাত্র আপোষহীনভাবে লড়াই করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে।

গৃহযুদ্ধেও আমাদের নেতাকর্মীরা ত্যাগের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন। প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও ত্যাগের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন। তাই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘ হতে পারল না। কর্মীদের মনে একে অপরের উপর বিশ্বাস ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সর্বদাই সত্যের পক্ষে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'ঐক্যপন্থী'। ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। রাজনৈতিক জীবনেও তিনি ছিলেন ঐক্যপন্থী। কিন্তু ঐক্যের বিপরীতে বিভেদ থাকে। তাই মতভিন্নতা আমাদের পার্টির অভ্যন্তরেও নীরবে নিভৃতে কাজ করেছে। সেটাই স্বাভাবিক। তাই প্রথম অবস্থায় সেটা ক্ষতি নয়, বরং উদ্যমই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অপরিণামদর্শী বিভেদপন্থীরা তা-ই এক পর্যায়ে বৈরী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করে। সমগ্র জুম্ম জনগণের জীবনে বিভেদের যে ধারা ছিল সে ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সে ধারা আমরা দেখেছি ১৯৮৩ সালে আমাদের গৃহযুদ্ধে। যে যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। তিনি মুক্তির পথে ছিলেন বলে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থান ছিল বিভেদের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাঁকে অপসারন করে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাথে সমতল অঞ্চলের সাথে মানুষের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়। সেই পাঁয়তারা করা হয়েছিল। সেজন্য বিভেদপন্থীরা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্বকে অনিশ্চয়তার দিকে নিক্ষিপ্ত তা নিজেও তারা জানতেন না। #

আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি।

-এম এন লারমা

(সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ)

১০ই নভেম্বর ঃ শোক ও চেতনার

বনিতা চাকমা

আজ ১০ই নভেম্বর ২০০৪। জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে চার কুচক্রীর বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে শহীদ হন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর সঙ্গে আটজন বীর যোদ্ধা। তাঁর মৃত্যুতে জুম্ম জাতীয় জীবনে যে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছিল সে ক্ষতি আমরা পুষিয়ে নিতে পারিনি আজও। নেতার ২০তম মহাপ্রয়াণ বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে আজ এই দিনে চার কুচক্রী জাতীয় কুলাঙ্গারদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আর শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি নেতা ও অন্যান্য বীর শহীদদের। ঘাতকরা সেদিন নেতাকে হত্যা করলেও তার চেতনাকে হত্যা করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনাকে দিয়ে জুম্ম জনগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)'র নেতৃত্বে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে বিশ্ব নন্দিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। অবসান হয় দীর্ঘ দুই দশকাধিককালের সশস্ত্র সংঘাতের। তারই সাথে বিলুপ্ত হয় সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে উঠে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো। গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জেলা কমিটি, থানা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি তথা তৃণমূল পর্যায়ের গ্রাম কমিটি।

চুক্তি-উত্তর পার্টি পুনর্গঠন পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পিসিপি, যুব সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন- এসব অঙ্গসংগঠনের পাশাপাশি নানা পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সংগঠনও গড়ে উঠে। এসব সংগঠনের মাঝেই আমরা প্রয়াত নেতার রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনাকে খুঁজে পাই। তাই ১০ই নভেম্বর শুধুমাত্র শোক নয়, চেতনারই প্রতিফলন। অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার মূলমন্ত্র।

এদিন স্মরণ করিয়ে দেয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সংগ্রামী চেতনা জুম্মদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত হয়ে আছে। তাঁর এই চেতনাকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজে পরিণত করতে হবে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের কাজে তাঁর অনুসৃত মহান নীতি-আদর্শকে প্রয়োগ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তবাদী শাসন-শোষণ জুম্মদের বাকরুদ্ধ করে রেখেছিল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশী-বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কোনদিন জুম্মরা প্রতিবাদ করতে পারেনি। এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে সর্বত্র ছিল সামন্তবাদের একাধিপত্য। এ সমাজে তাই জ্ঞান, গুণের কদর করার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারেনি। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রও তাই মহান নেতার ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তন হবার গুণকে গ্রহণ করতে পারেনি। বিপরীতে নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেদিন তারা সাধের সুরতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। অথচ নেতা চেয়েছিলেন বিপদগামী কুচক্রীদের ভুল শুধরাতে সহযোগিতা দিতে। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন বেগবান করতে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনি চেয়েছিলেন একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে- যেখানে থাকবে না কোনরূপ নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা। তাই তিনি ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির ভিত্তিতে চার কুচক্রীদের উদ্দেশ্যে দু'বাহু বাড়ান। আদর্শচ্যুত কুচক্রীদের মনে যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে সে কথা তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন। এজন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি হাজারো বিভেদের মাঝেও মিলনের চেষ্টা করে গেছেন। চার কুচক্রীদের বুঝাতে পারলেন না তিনি। কিন্তু পৃথিবীর অধিকার সচেতন মানুষ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মনের কথা বুঝতে বাকী রাখেনি কোন কিছুই।

সেটাই ১০ই নভেম্বরের শোক থেকে শক্তিতে রূপান্তর। এই শক্তি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ঘৃনাভরে চার কুচক্রীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তারা আজ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। এ পৃথিবীতে চক্রান্তকারীরা শয়নে জাগরণে সর্বদাই চক্রান্ত করে থাকে। আজ কুড়িটি বছর পরেও ১০ই নভেম্বরের বিভীষিকা এখনো কাটেনি। চার কুচক্রীদের উত্তরসূরী হয়ে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ চলমান আন্দোলনে কুঠারাঘাত হানছে। দুই দশকের অধিককালের অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত অনেক কর্মীকে খুন করে আত্মম্ভরীতে ফুলে উঠেছে। বিগত ছয়টি বছরে জনগণের গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী কিংবা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা যেমন এখনো দিতে পারেনি তারা; তেমনি কোন কর্মসূচীও ঘোষণা করতে পারেনি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ছিল শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। সেখানে থাকবে না এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর শোষণ-নিপীড়ন। থাকবে না নারী পুরুষের বৈষম্য। তিনি বুঝতে পেরেছেন নারী সমাজকে পশ্চাতে ফেলে রেখে জাতীয় মুক্তি অসম্ভব। নারীদের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন-"জুম্ম সমাজে নারী অধিকার সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।"

একদিকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা অপরদিকে নারীদের অধিকার ভোগ করার যোগ্যতা অর্জন এ দু'টো কাজ একযোগে করে যেতে হবে। নারী সমাজ একে তো অধিকার সচেতন নয় দ্বিতীয়তঃ অসংগঠিত। এ অবস্থা নিরসনের জন্য ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠিত হয়। কর্মী পরিবারসমূহ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হতে পারলেও আন্দোলন ও সমাজের বাস্তবতার কারণে এই মহিলা সমিতির কার্যক্রম এখনো আশানুরূপভাবে অগ্রসর করানো যায়নি। জুম্ম জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি রক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহিলা সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। মহিলা সমিতির ভূমিকাকে বাদ দিয়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সুদূর পরাহত। এ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের সক্রিয় সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

আজ ১০ই নভেম্বর ২০০৪। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আজও মন খুলে আমরা অনুষ্ঠান করার ভরসা পাচ্ছি না। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন মা, বোন আজো উৎকণ্ঠামুক্ত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পূর্বাবস্থা আজো সর্বত্র বিরাজমান। যে কোন সময় অপমৃত্যু মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র। বিশেষ করে নারীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা কোন অংশে হ্রাস পায়নি। এমতাবস্থায় একদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের তালবাহানা অপরদিকে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। এ অবস্থার আশু অবসান আমরা সবাই কামনা করি। তাই আসুন এই সংঘাত ভুলে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হয়ে একসঙ্গে কাজ করি এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র চিন্তা ও চেতনাকে স্বার্থক করে তুলি। #

১০ই নভেম্বর ঃ তার প্রেক্ষাপট

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

প্রত্যেক বছর ১০ই নভেম্বর দিবসটি পালিত হয় এবং হতে থাকবে। ইহার আগমনে ব্যতিক্রমী আবহ থাকার কারণে এই দিবসটি আমরা ভিন্নভাবে বরণ করে থাকি। প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থী হায়েনাদের হিংস্র গুলির আঘাতে আমাদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তাঁর আটজন দেশপ্রেমিক সহযোদ্ধাদের করুন মৃত্যুর স্মৃতিতে যখন আমরা এই দিনে শোক বিহ্বল হয়ে পড়ি, তখনই আমরা চেতনা ফিরে পাই। আমাদের মন সচেতন হয়ে উঠে। আমরা এই কথা ভেবে বিস্মিত হই - জুম্মদের স্বাধিকার আন্দোলনের পথে এই ষড়যন্ত্র, এত চক্রান্ত কেন? সমগ্র পৃথিবীতে মানব জাতির ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আজ নাগরিক, মানবিক অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। আর আমরা অর্থাৎ জুম্মরা ন্যূনতম মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য মাথা উত্তোলন করতে পারব না? কেন এ রকম হয় বা হবে? আমরা মানবিক বা নাগরিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকলে কারও কি ভয়ের কারণ আছে? না হলে প্রতিক্রিয়াশীলরা এত ষড়যন্ত্র করবে কেন? এই প্রশ্ন থেকেই আমরা আমাদের অতীত সম্বন্ধে সচেতন হই, অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করি। এবং তাতে আত্ম-অনুসন্ধান করার প্রেরণা লাভ করি। সংকটের জাল ছিন্ন করার উপায় অনুসন্ধান করি।

জুম্মদের চিরায়িত বাসভূমি ৫০৮৯ বর্গমাইল বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম। ইহা বাংলাদেশের এক দশমাংশ স্থান জুড়ে থাকলেও জনবসতির উপযোগী এবং চাষোপযোগী জমির পরিমাণ অতিশয় নগন্য। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ নগণ্য নহে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বর্নখনির মত মূল্যবান, অন্ততঃ আমাদের কাছে তাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা নিরীহ, শান্ত, সরল, নির্লোভ এবং অহিংস। তাই এখানে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের লোক সুর্দীঘকাল ধরে একত্রে সম্প্রীতির মধ্যে শান্তিময় জীবন যাপন করে আসছে।

দীর্ঘদিন অবহেলিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল কয়েকবার। ত্রিপুরা রাজ্য এবং আরাকান রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগ হওয়ার কারণে ত্রিপুরা রাজশক্তি এবং আরাকান রাজশক্তির মধ্যে বহুবার যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল এই মাটির বুকে। এই রাজশক্তির সংঘর্ষে দোর্দন্ড প্রতাপ মোগল শক্তিও জড়িত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন শক্তি এই অঞ্চলে রাজত্ব করতে পারেনি বা করেনি। এই কারণে দিগ্বিজয়ে বহির্গত বা অভিযানরত চাকমা রাজা সসৈন্যে এ অঞ্চলে রাজ্যপত্তন করেন। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন গোত্রের (মঙ্গোলীয় জাতিভূক্ত গোত্র সংখ্যা সমধিক) লোকজন এসে তাদের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেন। সরকারী নথিপত্র থেকে বোঝা যায়, চাকমা রাজ্যের সীমা (Territorial-boundarx) নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট না থাকলেও, চাকমা প্রজাগণ যেখানে বসবাস করতেন বা তাদের প্রাধান্য ছিল এবং চাকমা রাজার শাসন কার্যকর ছিল, সেই এলাকা নিয়েই চাকমা রাজ্য বর্তমান ছিল।

পরবর্তীকালে চাকমা রাজ্যের সীমানা উল্লেখ করা হয় এই ভাবে- Mr. Henry Verlst, the first chief of the Chittagong Council, in a proclamation dated 6th Shravan 1170 moghi Shan(1763AD), states the local jurisdiction of Raja sheramust khan, to be- " all the hills from the Pheni river to the Sangu and from Nizampur Road to the hills of the Kuki Raja"- Referring to the territory over which the Chakma Raja claimed Supremacy. এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্ণফুলী নদীর উপনদী হালদা, শিলক, ইছামতীর অববাহিকা এবং রাঙ্গুনীয়ার বিশাল সমতল অঞ্চলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহদাংশ চাক্মা রাজ্যভূক্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বোমাং রাজ্য। এখানে উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে- According to the contemporary sources, the title of Raja as head of the state was awarded by the Arakanese rulers. The Rajaship was officially recognized by the mughols who acknowledged the king as the legitimate rule of the Chakmas. The mughol government did never interfere in their political autonomy. (সূত্রঃ Chakma resistance to British Domination- Suniti Bhushan Canungo-page 18-19)। মোগল সরকার কোনকালে জুম্ম জনগণের স্বাধীন জীবনযাত্রার উপর হস্তক্ষেপ করেনি বা বিস্তীর্ণ চাকমা রাজ্যের এক ইঞ্চি বেদখল করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এই কথা সরকারী নথিপত্রে অমর হয়ে রয়েছে।

সমতলের অধিবাসীবৃন্দ যারা মোগল অধিকারভূক্ত এলাকার লোক তারা চাকমা রাজ্য থেকে গাছ, বাঁশ, শন, বেত প্রভৃতি বনজসম্পদ আহরণের বিনিময়ে পাহাড়ীরা ঐ সমতল এলাকা হতে (মোগল শাসিত এলাকা) লৌহজাত দ্রব্য যেমন- দাও, কাস্তে, কুড়াল, কোদাল এবং লবন, গুড়, তামাক, রঙীন সুতা ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। এজন্য একটি বিনিময় চুক্তি হয়েছিল চাকমা রাজ্য এবং মোগল সরকারের মধ্যে। পাহাড় থেকে বনজ সম্পদ সমতলে নিয়ে আসার ট্রানজিট ফিস এবং ঐ বিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে চাকমা রাজ্য হতে বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে কার্পাস (তুলা) মোগল সরকারকে দেওয়া হত। কিন্তু তা রাজস্ব নয়, তা ছিল Voluntary Contribution, ইহা কোন দিন Territorial Revenue ছিল না। ১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে

ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করলে মীরজাফর আলী খাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসায় ইংরেজরা। তাঁর কাছ থেকে বর্ধমান ও অন্যান্য কতিপয় এলাকার সাথে চট্টগ্রামের দেওয়ানীও ইংরেজরা ১৭৬০ সনে লাভ করেন। ১৭৭২ সালে রাঙ্গুনীয়া এলাকা রেগুলেশন অন্তর্ভূক্ত না করা পর্যন্ত চাকমা রাজ্যের কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন ইংরেজরা। তবে মোগলদের (মীরকাশিম) কাছ থেকে ক্ষমতা লাভের সূত্রে (বা ক্ষমতা প্রাপ্তির অজুহাতে) বাঁশ, গাছ, শন, বেত প্রভৃতি বনজ সম্পদ আহরণ এবং সেই সব পরিবহনের জন্য ট্যাক্স আদায় করতে আরম্ভ করেন। পশুচারণ ক্ষেত্র এবং জুম থেকেও রাজস্ব আদায়ের সূত্রপাত করেন। যেহেতু চাকমা রাজ্যের কোন নির্ধারিত সীমা ছিলনা – ইংরেজরা সুবিধাজনক যে কোন Point–এ এই ধরণের রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকেন। এই আদায়কৃত ট্যাক্স থেকে কোন অংশ চাকমা রাজা বা বোমাং রাজাকে তাঁরা দিতেন না। ইংরেজ বা বৃটিশরা প্রথমে সীতাকুন্ড, করলডাঙ্গা এবং ডলু এলাকাতে প্রথম ট্যাক্স আদায় সূচনা করেন।

১৭৬০ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের দেওয়ানী লাভের সময় নবাব কর্তৃক চট্টগ্রামের কোন সীমারেখা নির্ধারিত হয়নি। ফলতঃ চাকমা রাজ্য ও বৃটিশ অধিকারভূক্ত জায়গার মধ্যে কোন সীমারেখা স্পষ্ট না থাকায় বাঙালী অধ্যুষিত চাকমা রাজ্যের স্থানগুলি বৃটিশরা দাবি করে বসেন এবং ক্রমে ক্রমে সহজেই তাদের অধিকারভূক্ত করে ফেলেন। ১৭৭২ সালের এপ্রিলে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফোর্ট উইলিয়ামের (দুর্গ) প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করলে পাশ্ববর্তী বা দেশীয় রাজ্যগুলিতে হস্তক্ষেপ না করার পূর্বতন বৃটিশ নীতি বর্জন করেন এবং দেশীয় বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি দখল করে বৃটিশ অধিকার সম্প্রসারণ করার নীতি গ্রহণ করেন। চাকমা রাজ্য তার এই সম্প্রসারণ নীতির কবলে পতিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে হালদা নদী পার হয়ে রাঙ্গুনীয়ার বিশাল এলাকা বৃটিশরা তাদের অধিকারভূক্ত করে ফেলেন। মোগল আমলে চাকমা রাজ্য হতে নির্দিষ্ট যে কার্পাস (তুলা) Voluntary contribution হিসেবে প্রদান করা হত বৃটিশরা তা দাবি করেন এবং তা Territorial ট্যাক্স বা রাজস্ব হিসেবে দাবি করেন। এ Voluntary contribution কার্পাস মহাল নামে পরিচিত।

বৃটিশদের এই আগ্রাসী কার্যক্রমে চাকমা রাজা ও নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজা শেরদৌলত খাঁ এবং তাঁর অল্পবয়স্ক সেনাপতি রুনু খাঁ দেওয়ান নেতৃত্ব দিতে রাজী হলেন। বৃটিশরা চাকমা রাজ্যে কোন ট্যাক্স আদায় করতে গেলে প্রতিহত করার চেষ্টা হতে লাগল। তাই বৃটিশের রাজস্ব আদায়কারী লোকদের সঙ্গে চাকমা প্রতিরোধকারীদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতে লাগল। শেরদৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র জানবক্স খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করলে রুনু খাঁ দেওয়ান তার প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন। তিনি তখন পূর্ণ যুবক এবং প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ এক সংগ্রামী মানুষ । রুনু খাঁ দেওয়ান শক্ত সমর্থ পালোয়ানদের তাঁর দলভূক্ত করে নব উদ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করলেন। রুনু খাঁ দেওয়ানের নেতৃত্বে কুন্নু খাঁ দেওয়ান, বল্লভ, চাদি, ধুত্তাং প্রভৃতি দেশপ্রেমিক অকুতোভয় নেতৃবৃন্দ প্রশিক্ষণবিহীন পালোয়ান নিয়ে সুশিক্ষিত বৃটিশ সৈন্যের মুখোমুখি হলেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৃটিশ সৈন্যের মুখোমুখী হয়ে লড়াই করা প্রশিক্ষণবিহীন পালোয়ানদের পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়, তাই রুনু খাঁ গেরিলা কায়দা অবলম্বন করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বহু ষড়যন্ত্র করে এবং বহু কৌশল অবলম্বন করে বৃটিশরা রুনু খাঁ-কে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলেন কিন্তু করতে সক্ষম হলেন না। বৃটিশরা দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। ফলে চাকমা রাজ্যের দরিদ্র প্রজাগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। এই দীর্ঘায়িত লড়াইয়ে চারপাশের বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে প্রতিরোধ যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে যায় এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের দিকে চাকমা রাজা জব্বার খাঁ-বৃটিশদের সঙ্গে একটি মীমাংসা চুক্তিতে সম্মত হন। ফলে চাকমা রাজ্য বৃটিশ অধিকারভূক্ত হয়ে যায়। কথিত আছে রুনু-খাঁকে বৃটিশরা গ্রেপ্তার করতে পারেনি, তিনি দোহাজারীর বনাঞ্চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং অবশেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

বৃটিশরা সমগ্র চাকমা রাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ১৮৬০ সালে Chittagong Hill Tracts নামে একটি পৃথক জিলা গঠন করেন। বৃটিশ অধিকারভূক্ত চট্টগ্রাম ও চাকমা রাজ্যের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকার কারণে বৃটিশরা চাকমা রাজ্য হতে ট্যাক্স বা রাজস্ব আদায় করতে গেলে চাকমা রাজ্য থেকে প্রবল বাঁধা আসে। ইহা বৃটিশ আর জুম্ম প্রজাদের ভুল বুঝাবুঝির কারণে হয়েছিল। তাতে বৃটিশরা স্বভাবতই জুম্মদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে যেই কারণে তাদের কঠোরভাবে দমণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জুম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার কারণে জুম্মদের সরল জীবনযাপন, তাদের হিংসাহীনতা, লোভহীনতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং সভ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে বৃটিশদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়। সেই জন্য তাদের শান্তিপূর্ণ, নিরুপদ্রব জীবন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই অঞ্চলে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ জারী করা হয়েছিল।

এই হল পার্বত্য চট্টগ্রামের গোড়ার ইতিহাস। প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করার পর ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করে চলে যায়। ১৯৪৭ সালে Indian Independence Act, Act.1 of 1947 এর বলে ভারতবর্ষে মুসলমান অধ্যুষিত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান এবং অমুসলিম যথা -হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারত রাষ্ট্র স্থাপিত হয় । ৯৮.৫০ শতাংশ অমুসলমান (জুম্ম) অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ঐ আইনে ভারত রাষ্ট্রে অন্ত র্ভূক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান, ঘনশ্যাম দেওয়ান, বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (ত্রিপুরা), বোমাংগ্রী, স্নেহ কুমার চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির ব্যানারে তজ্জন্য আন্দোলনও

করেছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সকালে স্নেহ কুমার চাকমা ও ছাত্রবৃন্দের সমন্বয়ে রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল । কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তান অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ২২শে আগষ্ট ভারতীয় পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয় তার বদলে।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভারতবর্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান এবং একমাত্র লড়াকু দল ছিল। তৎকালীন পূর্ববাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। অতুলনীয় উৎসাহে পূর্ববাংলার মুসলমানেরা মুসলিমলীগের ব্যানারে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ধ্বনি উচ্চারণ করে নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর অনুগমন করেছিলেন এবং পাকিস্তান কায়েমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হবার পরপরই পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এখানকার মুসলমানদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মুসলিমলীগ নেতা, পাকিস্তানের স্রষ্টা (?) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল এর ভাষণে প্রকাশ করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। বাঙালী মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় উচ্চারিত গভর্ণর জেনারেল তাদের কায়েদ-এ-আজম (জাতির পিতা) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই দম্ভোক্তি-বাঙালী মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল। সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা, এই বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি আখ্যা পেয়েছিলেন এবং নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় পূর্বপাকিস্তানী বাঙালীরা ক্রোধে ফুঁসে উঠেলেন। ইহার প্রতিকারার্থে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৫২ সালের বাঙালীরা রাজপথে রক্ত দিলেন, জীবন দিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বর। সেই একুশে ফেব্রুয়ারীর এক শুভক্ষণে কিংবা অশুভক্ষণে তাদের বুকের লাল রক্ত বাংলার মাটিতে যখন ঝরে পড়ল -তাই বীজ হয়ে অঙ্কুরিত হয়ে- হয়ে গেল স্বাধীনতার মহা মহীরূহে।

সুদীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সহায়তায় স্বৈরাচারী পাকিস্তানী বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পরাজয় বরণ করল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম হল। এই যুদ্ধে আদিবাসী জনগণকে সম্পৃক্ত করা না হলেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বহু আদিবাসী যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকে শহীদও হয়েছিলেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার থেকে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী বাঙালী পরিবারকে পাহাড়ে লুকিয়ে রক্ষা করে ছিলেন। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জুম্ম জনগোষ্ঠী আশা করেছিলেন বাঙালীদের সাথে তারাও স্বাধীন হয়ে গেলেন, স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও ইহা একটি উপনিবেশ বলে গণ্য করা হল। জুম্ম বা আদিবাসী জনগণকে অবাঞ্ছিত মনে করে নিরীহ জনগণ এবং মা বোনদের উপর নির্যাতন অত্যাচার চলতে থাকল। পানছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণহত্যা করা হল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সচেতন নেতৃস্থানীয় জুম্মদের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন এবং প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয় এবং তাঁকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমরণ জনসংহতি সমিতির সভাপতি ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র জনতা, সচেতন ব্যক্তি নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অবস্থার উন্নয়নে আন্দোলন শুরু করলেন। বলাবাহুল্য এই আন্দোলনের পুরোধাই হচ্ছেন গণপরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এই জনসংহতি সমিতিই হল পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র এবং প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন।

স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ এর অধিবেশনে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া বিল উত্থাপন করেন। এই সংবিধানে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রবাদ ভিত্তিস্তম্ভ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এবং অন্যান্য আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগণের কোন উল্লেখ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অধিকন্তু বাংলাদেশের চির অবহেলিত নারী, কৃষক, শ্রমিক, কুমার, তাঁতী, নৌকামাঝি, রিক্সাচালক এবং খেটে খাওয়া ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া সংবিধানে লেখা রয়েছে বাংলাদেশের সকল স্থায়ী বাঙালী নামে পরিচিত হবে। এর মাধ্যমে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী হিসেবে অভিহিত হলো।

গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশনে দীর্ঘক্ষণব্যাপী হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। অবশেষে কারও কোন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম সংসদ নির্বাচনে ১৯৭৩ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর আসনে চাইথোয়াই রোয়াজা সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দেশপ্রেম, নিপীড়িত জুম্ম জনগোষ্ঠির জন্য বেদনা এবং সংগ্রামের কথা উপলব্দি করেছিলেন – কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সমন্বয় আনয়নের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ

লারমার আকুতিতে গুরুত্ব প্রদান করতে সক্ষম হননি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সকল দাবিদাওয়া বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হতে থাকে। তাই তিনি জুম্ম নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকের এই সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধুকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে ছিল জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। স্মারকলিপি পাঠ করে শেখ মুজিবুর রহমান রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিলেন – "লারমা, তোমরা কি মনে করো? তোমরা আছ মাত্র ৫/৬ লাখ, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না। (হাতের আঙ্গুলে তুড়ি মেরে তিনি বললেন) প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, কি ১০ লাখ বাঙালী অনুপ্রবেশ করিয়ে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো।" (সূত্রঃ মানবেন্দ্র লারমার জীবন ও সংগ্রাম হিমাদ্রী উদয়ন চাকমা। ১০শে নভেম্বর ৮৩ স্মরণে - ২০০০ সাল পৃ-৩)।

১৯৭৩ সালেই জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবিদাওয়ার প্রতি নমনীয় হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বহুজাতিক বসবাসসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা অনুধাবন করে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বের সংরক্ষণ বিষয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা সহানুভতির সঙ্গে বিবেচনা করার কথা দিয়েছিলেন। তাঁর নবগঠিত বাকশালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সদস্য পদ দান করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন শুভ সময় বহু দুরে চলে গেছে। সুবর্ণ মুহূর্তগুলি অতীত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগষ্ট সপরিবারে হত্যা করে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন থেকে আত্মগোপন করেন। সকল গণতান্ত্রিক উপায়সমূহ রুদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার পরিবর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বনই উপযুক্ত বলে মনে করলেন। এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করেন। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কুটচালের মারপ্যাঁচে পরে তিনি স্বল্প দিনের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তৎকালীন প্রভাবশালী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট এর পদ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পার্বত্য চট্টগ্রামে লাখ লাখ বাঙ্গালী ঢুকিয়ে দেবার যে হুমকি পরবর্তীতে জেলারেল জিয়াউর রহমান বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি তড়িঘড়ি করে ১৯৭৯-৮০ সালে স্বল্প সময়ে ৪ লাখ বাঙ্গালী সেটেলার পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন সম্পন্ন করলেন। জুম্ম জনগণ এই অভিবাসন মেনে নিতে পারেনি, মেনে নেয় নি এবং শান্তিবাহিনী বাঁধা দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অবলম্বন করলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৩৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি সদরের স্বল্প দূরে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু মহাপ্রুম গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত চাকমা পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী চিত্তকিশোর চাকমা ছিলেন উক্ত গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর পিতৃব্য স্বনামধন্য কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক কিংবদন্তী পুরুষ। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী মারবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বভাবতই ভদ্র, মার্জিত, মহানুভব ছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও অবহেলিত পার্বত্যবাসীর দুঃখ দুর্দশা লাঘবসহ সর্বপ্রকার উন্নয়নে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে কর্ণফুলি নদীর বুকে আড়াইশত বর্গমাইলব্যাপী যে জলাশয়ের সৃষ্টি হয় তাতে শতশত সমৃদ্ধ গ্রাম জনপদের সঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্মস্থান মহাপ্রুমও অতলে তলিয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্রজীবনেই সেই দুঃখ দুর্দশা লাঘবের মহানব্রত গ্রহণ করেন। বৃটিশ আমল হতেই অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল- কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকুলতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতাসহ নানা কারণে সেই সব নেতৃত্ব লক্ষ্যে উপনীত হবার পূর্বেই স্তিমিত হয়ে যায়। চল্লিশের দশকে পাহাড়ী ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মাধ্যমে পাহাড়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দ পার্বত্যবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ শিক্ষা লাভের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের সংগঠিত করেন। ছাত্র আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কাপ্তাই বাঁধের বিরোধীতা করা হয় এবং ১৯৬৩ সালে কাপ্তাই বাঁধের প্রতিবাদে হ্যান্ডবিল বিলি করার সময় চট্টগ্রাম আদালত ভবনের সামনে ১০ ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানের সরকার তাঁকে কয়েক বছর জেলে আটক রাখে। কারাগারে অবস্থান কালে তিনি বি.এ পাশ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেন এবং জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এভাবে তিনি ছাত্র সমাজ এবং জুম্ম জনগণের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তিরোধানের পরপরই তাঁর সহোদর ভ্রাতা বীর দেশপ্রেমিক, ফিল্ড কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সহযোদ্ধা রূপায়ন দেওয়ান, উষাতন তালুকদার, গৌতম কুমার চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, চন্দ্রশেখর চাকমা, মাধবীলতা চাকমা সম্মিলিতভাবে শান্তিবাহিনীর স্বদেশপ্রেমিক অকুতোভয়

শত শত যোদ্ধাগণ বিজয়ের পথে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে লাগলেন। তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তার কারণে, আন্দোলনের যৌক্তিক বিচারে বাংলাদেশের সরকার অনুধাবন করলেন জনসংহতি সমিতির স্বাধিকার আন্দোলন ন্যায়সংগত। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে অগ্রসর হলেন এবং তা ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত হয়ে গেল।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অঞ্চল স্বীকৃতি দিয়ে এবং জুম্মদের প্রাণপ্রিয় নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চালু করা হল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (সংক্ষেপে শান্তিচুক্তি) সমগ্র বিশ্বব্যাপী অভিনন্দিত হয়েছে। ইসলামিক বিশ্বেও ইহার জন্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। ইরানও পার্বত্য চুক্তিকে সানন্দে অভিনন্দিত করেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালীদের জীবনে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের বিপুল সম্ভাবনার আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সাত বৎসর অতীত হতে লাগল সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না সরকার । অধিকন্তু, এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বাঙালীকে সেটেল করা হয়েছিল তারা আজ বাংলাদেশ সরকারের বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভূমিহীন সেটেলারদের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা আছে কি? তারা মানসিকভাবে নিজেদের বহিরাগত মনে করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে বসবাসকারী সেটেলার মনে করে। তাই তারা গায়ের জোরে এখানকার আদিবাসী জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালীদের উৎখাত করার আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করে। ইসলামী সম্প্রসারণবাদী মৌলবাদী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত এই সব সেটেলার হীনমন্যতায় ভোগার কারণে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন" "বাঙালী গণ পরিষদ" গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের পাঁয়তারা করছে। কিন্তু তাদের একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত বর্তমান সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য আন্দোলন বিশ্বব্যাপী চলছে সেই আন্দোলনের মুখে তাদের অনুসৃত ভ্রান্তনীতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আজ জাতিসংঘ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামসহ বিশ্বের মানবতাবাদী জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি সজাগ ও সহানুভূতিশীল। #

'ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ- এই তিন প্রকার গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।'

-মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকান্ডকে প্রতিহত করুন।

-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সুভাষিণী দেওয়ান একজন আদর্শ মাতার নাম

জড়িতা চাকমা

সমাজব্যবস্থা সামন্তবাদী ও পিতৃতান্ত্রিক। উৎপাদন ব্যবস্থাও তাই। তবুও দেশী-বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের মাত্রা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে অস্বচ্ছ। তখন কোন কোন পরিবারে ছিল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। এসব নিয়ে তখনকার সময়ে জুম্ম সমাজের মহাজন মানুষের পরিচয় হতো। গোটা সমাজে এ সংখ্যাটা ছিল নগণ্য। তারপরও তখনকার আমলে সাধারণ মানুষের ভাষায় বলা হতো 'তখন সুখ ছিল'। জুম্ম সমাজের মানুষ তখন থেকেই নারী-পুরুষ সবাই ছিল সহজ-সরল এবং ঝগড়াঝাটিহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সেদিন বেশী আর স্থায়ী হলো না। এখন গোলাভরা ধানের অস্তিত্ব আর নেই। অনুন্নত, পশ্চাদপদ ও অধিকার বঞ্চিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের কাছে সরকারের সাধারণ প্রশাসন ছিল ভীতিজনক একটা কিছু। তাই সে সময় সাধারণ জুম্মরা পুলিশের খাকী পোশাকধারী মানুষ দেখলেই ভয়ে পালাতো। এ অবস্থা থেকে 'থানার দিকে কানাও যায় না' এরকম একটা প্রবাদ বাক্য এদেশের মানুষের মুখে মুখে শোনা যেতো।

ঠিক এরকম একটা সমাজেই এক শুভক্ষণে মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের কোলে আসেন সুভাষিণী দেওয়ান। তাঁর জন্মভূমি ছিল বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা সদরস্থ খবংপয্যা গ্রামে। পিতা রমেশ চন্দ্র দেওয়ান আর মাতা হলেন চন্দ্র মুখী দেওয়ান। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার আদরের কন্যা সন্তান। তখন নারী শিক্ষার গুরুত্ব সমাজে খুব একটা ছিল না। সে কারণে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (সে আমলে উচ্চ প্রাইমারী, সংক্ষেপে u.p.) গন্ডী পেরুতে পারেনি। তবুও এই সাধারণ শিক্ষা দিয়ে তিনি আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সর্বোপরি বাবার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে একজন আদর্শ জননী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আজ আমাদের মাঝে প্রাতঃ স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার স্বামী ছিলেন ছোট মাউরুমের (রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর থানাধীন) নিবাসী চানমনি চাকমার ছেলে স্বর্গত চিত্ত কিশোর চাকমা, একজন কৃতি ছাত্র ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। চিত্ত কিশোরবাবু তাঁর নিজ গ্রামে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের দৃষ্টান্তমূলক সমাজসেবার কাজে হাত দেন। তাঁর এ সমাজসেবা কাজের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি।

সমাজের পাশাপাশি ধর্মের উপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। ধর্ম দিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা তথা উন্নয়নের কথা তিনি মানুষকে বুঝাতেন। শেষজীবনে তিনি একজন শীলবান ভিক্ষু (লোকপ্রিয় মহাস্থবির) হিসেবেই কাটিয়েছেন। বাধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ১৯৯৯ সালে ১২ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে শ্রদ্ধেয় চিত্ত কিশোর চাকমা পরলোক গমন করেন। তারও আগে ১৯৮০ সালের ১১ মার্চ পানছড়ি উপজেলাধীন শুকনাছড়ি নামক স্থানে জঙ্গল পরিবেষ্টিত সোনাধন নামে এক গরীব কৃষকের ঘরে দীর্ঘ রোগভোগের পর সুভাষিণী দেওয়ান মারা যান। দেশের অবস্থা তখন চরম দুর্যোগপূর্ণ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর ছিল সেনা শাসন, নির্যাতন। প্রতিদিন বিকেল বেলায় ঘর ছেড়ে জঙ্গলে রাত যাপন করা ছিল তখনকার দৈনন্দিন কাজের অংশ। রাতে গ্রামগুলো ছিল পুরুষশূণ্য। এরকম পরিস্থিতিতে তার সমাধির জন্য সোনাধন চাকমা ভূমি দান করেন। তখন মায়ের সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়ে বর্তমান নেতা (সদ্য জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সন্তু লারমা) আর্মিদের কাছে পিট মোড়া করে কোমরে বাঁধা অবস্থায় বন্দী হন। অগ্রজা জ্যোতিপ্রভা লারমা বাঁধন খুলে দেবার জন্য জোর দাবী করলে তাঁকে আর্মিরা বাঁধনমুক্ত করে দেয়। সুভাষিণীর সমাধিক্ষেত্র এখনও অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

সুভাষিণী দেওয়ান একজন সুগৃহিনী ও স্বামীর সহধর্মিনী হিসেবে একদিকে শ্বাশুর-শ্বাশুরীর অন্যদিকে তাঁর স্বামীর সমাজ রক্ষা করে দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিশ্রমী, সহনশীল, ধৈর্য্যশীল ও তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হতেন। নারী হিসেবে গৃহস্থালী ও হস্তশিল্প কাজেও তিনি ছিলেন সুনিপুনা। পুরনো দিনে গুরু-শিষ্য সম্পর্কটা চোখে পড়ার বিষয়। তখন ছাত্ররা শিক্ষকের বাড়ীতে থাকতেন এবং পড়াশুনা করতেন। সেসকল ছাত্রদেরও পুত্রস্নেহে আদরযত্ন করতেন সুভাষিণী দেওয়ান। সে সময় তাঁদের বাড়ীতে খেয়েদেয়ে পড়াশুনা করা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পৃথিরাজ চাকমা, সঞ্জীবন দেওয়ান, স্মৃতিরূপা দেওয়ান, ভদা চাকমা, যুগময় চাকমা, কুলকুসুম চাকমা, জয়ন্ত চাকমা, ললিত চাকমা, বিনোদ বিহারী খীসা, দীপান্বিতা চাকমা ও আরো অনেকে। এইসব ছাত্র-ছাত্রী ভরণপোষণ ছিল তাঁর গুরুদায়িত্ব। তিনি পতিব্রতা এবং দুরদর্শী একজন মা ছিলেন বলেই পুত্রসন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সুভাষিণী দেওয়ানের এক মেয়ে ও তিন ছেলে। মেয়ে জ্যোতিপ্রভা চাকমা সবার বড়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, যিনি বাবার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো একজন (অবঃ) সরকারী প্রধান শিক্ষিকা। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী হয়ে সমাজ সেবার কাজে নিয়োজিত আছেন। দ্বিতীয় পুত্র শুভেন্দু প্রভাস লারমা, যিনি খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলায় তখন কৃষি বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি জুমচাষের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে কৃষিকাজে জুম্মদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তিনি ৮০-র দশকের দিকে পানছড়ির আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে সরাসরি পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে এম এন লারমাসহ বিভেদপন্থীদের গুলিতে নিহত হন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থানীয় হয়ে আছে তাঁর বিপ্লবী কর্মময় জীবন। এম এন লারমা তৃতীয় এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ট সন্তান। সন্তু লারমা বর্তমানে জনসংহতি সমিতির সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান। সর্বোপরি বর্তমানে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি পদে আসীন। তাই তিনি শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০ ভিন্ন ভাষা-ভাষি মানুষের নেতা নন; তিনি সমগ্র বাংলাদেশের আদিবাসী মেহনতি মানুষেরও নেতা। তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশের ৪৫ টি আদিবাসী গোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিপ্লবের ইতিহাসে কোরিয়ার জননী ক্যান-ভ্যান সোক এর বিপ্লবী কর্মকান্ডের কথা বিশ্বের নারী অধিকার আন্দোলনে সমাদৃত। কোরিয়ার মহান নেতা কিম ইল সুং তাঁর গর্ভের সন্তান। কোরিয়ার মহান বিপ্লবের জন্য তাঁর সন্তানকে লালন পালন করেছিলেন। মহান নেতার জননী ক্যান-ভ্যান সোক তখনকার সময়ে বিপ্লবী কর্মীদের ভাতের ফেনা পর্যন্ত ভাগ করে খাওয়াতেন। কর্মীদের জুতা নিজে সুঁচ-সূতা দিয়ে সেলাই করে দিতেন। শত্রুর টহলদার বাহিনীর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতেন। এজন্য স্বাধীন কোরিয়ার জনগণ ক্যান-ভ্যান সোককে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ইতিহাসের পাতায় স্থান দিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতার সাথে ক্যান-ভ্যান সোকের নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে সুভাষিণী দেওয়ানও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জননী হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।

১৯৯৫ সাল। তখন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র বিশ্বে আন্দোলন তুঙ্গে। সে সময় আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের মহিলা সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি শহীদ প্রশান্ত কুমার চাকমার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'শহীদ জুলো মেমোরিয়াল' প্রাঙ্গনে বিভিন্ন খেলা ও পুরষ্কার শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুভাষিণী দেওয়ানের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরা হয়। তারই সাথে সাথে মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় পাঠাগার 'সুভাষিণী পাঠাগার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন থেকেই আমাদের পার্টিতে মহিলা সমিতির সদস্য ও পার্টি কর্মীদের কাছে নারী আন্দোলন সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি পায়।

নারী আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের পথ সুগম করার জন্য 'সুভাষিণী পাঠাগার' নারী সমাজে চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বই পড়তে উৎসাহ যুগিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মহিলা সমিতির এই সুভাষিণী পাঠাগারকে শুধু কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাকে জেলা, থানা, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে পারলে নারী অধিকার আন্দোলনে আরও শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছেন; 'আমাকে একজন আদর্শ ও শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো'। জাতি গঠনে মায়ের যথাযথ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে নেপোলিয়ন এ কথা বলেছেন। আজ প্রয়াত সুভাষিণী দেওয়ানের মত মা গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে মায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের পার্টি কর্মীদের মুখ থেকে নেপোলিয়নের কথা বেরিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থায় যেখানে পুরুষের মান-মর্যাদা নেই সেদেশে নারীদের অবস্থান আরও বেশী অবহেলিত। এখানে কল্পনা চাকমা এদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন হিসেবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সহ্য করতে পারেনি। তিনি লেঃ ফেরদৌস কর্তৃক রাতের অন্ধকারে অপহৃত হয়েছেন। যে ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট সরকার আজও প্রকাশ করতে পারেনি। সেনাবাহিনী একটা দেশের গৌরব। কিন্তু এ বাহিনী নারী সমাজকে অপমান করেছে। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী সেখানে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ হচ্ছে না। সভ্য দুনিয়ায় এর চেয়ে দুঃখজনক কী আর থাকতে পারে?

এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন পর্যন্ত নারীদের পদচারণা। অথচ আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সমাজের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ ১০ নভেম্বর ২০০৪। প্রয়াত নেতা এম এন লারমার মৃত্যু বার্ষিকীতে সুভাষিণী পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হোক সেটা আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা। এদেশের বেগম রোকেয়া, বেগম সুফিয়া কামাল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ নারীব্যক্তিত্ব দেশ ও জাতির স্বার্থে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে অনেক সমৃদ্ধ করে গেছেন। আমাদের সুভাষিণী দেওয়ানের স্মৃতি রক্ষার্থে গঠিত 'সুভাষিণী পাঠাগার' দিয়ে আমাদের নারী সমাজকেও এগিয়ে নেয়া অনস্বীকার্য। সুভাষিণী দেওয়ান যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজ থেকে হারিয়ে না যায়। যেহেতু তাঁর গর্ভজাত এম এন লারমা জুম্ম জাতিকে সামনে এগিয়ে যাবার পথ সুগম করেছেন।

নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত মানুষকে সেবা করার জন্য তিনি সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকে যে নেতৃত্ব দান করে গেছেন আজ সে নেতৃত্বকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য নারী সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সুভাষিণী দেওয়ানের আদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ছাড়া নারী সমাজ এ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছেন, 'জুম্ম সমাজে নারী অধিকার সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।' আজ এম এন লারমার উক্তির সফল বাস্তবায়ন কামনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে প্রয়াত সুভাষিণী দেওয়ানকে পরম শ্রদ্ধা জানাই। #

শহীদের তালিকায় রাসেল

উজ্জ্বল চাকমা

২০০৩ এর ১৩ ডিসেম্বর। রাঙ্গামাটি শহরে সেদিন বিকাল ৫টার দিকে রুম হতে বাহির হয়েছিলাম। বিজন সরণী সড়কে মোড়ের রাস্তায় পার্বনবাবুর সাথে দেখা হয়েছিল। আমাকে ডেকে তিনি বললেন, আজ খাগড়াছড়িতে বিকালের দিকে একটি ঘটনা ঘটেছে। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, কি ঘটনা ঘটেছে? তিনি বললেন, কিছুক্ষণ আগে টেলিফোনে খবর পেয়েছেন খাগড়াছড়ি শহরে পানখাইয়া পাড়া স্থানে সন্ত্রাসীরা রাসেলকে হত্যা করেছে এবং গুরুতর আহত হয়েছে একজন। খবরটা শুনার সাথে সাথে দ্রুত পার্টির কল্যাণপুরে কেন্দ্রীয় অফিসে খবর নিলাম। সেখানে খবর নিয়ে জানলাম, সত্যিই রাসেলকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর বৌদি অন্তরা খীসাকে অজ্ঞান অবস্থায় হসপিতালে ভর্তি করা হয়েছে। ততক্ষণে শোকের ছায়া নেমে আসলো পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থানরত সকল নেতা-কর্মীর মাঝে। আমার ভাবতে অবাক লাগছিল, তাঁকে আর খাগড়াছড়িতে গেলে দেখতে পাব না। ৮ ডিসেম্বর হরতালের শেষে এম এন লারমা ভাস্কর্যের পাদদেশে একটি সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে বলেছিলাম, "আমাদের অনেক সহযোদ্ধার প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমরা আর কোন সহযোদ্ধাকে আমাদের মাঝ থেকে হারাতে চাই না।" সারাদিন হরতাল পালনের পর পরিশ্রান্ত রাসেল ভাইও সেদিন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সন্ত্রাসীরা তাঁকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দিলো না। হরতালে অংশগ্রহণকারী শত শত সহযোদ্ধার মাঝ থেকে তিনি চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

জুম্ম জাতির বুক থেকে আরেকজন বীর যোদ্ধার প্রাণ কেড়ে নিলো চুক্তিবিরোধী, জাতীয় বেঈমান, কুচক্রী, বিভেদপন্থীরা। জাতি হারালো এক অকুতোভয় সাহসী যোদ্ধাকে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শোকাহত তাঁর স্ত্রী, পরিবার-পরিজন তথা পার্টির প্রতিটি নেতা-কর্মী। বুলেটের আঘাতে তাঁর বুক ঝাঁঝরা করেছিল সন্ত্রাসীরা। সেদিন তাদের হাত একটুও কাঁপেনি। যে মানুষটি দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন জুম্ম জাতির অধিকারের জন্য, তাঁকে জাতীয় শত্রুরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নির্মমভাবে হত্যা করলো। তাদের বিবেক মানবতা বলতে কিছু নেই!

রাসেল আত্মবলিদানে উৎসর্গীকৃত একজন সৈনিক ছিলেন। চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠ আজো আমার চোখের পর্দায় ভেসে উঠে। নির্মম দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রজ বীর যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছিলেন। শোষণ নিপীড়নের জঘন্য রূপ দেখেও তিনি আন্দোলন থেকে এক পাও পিছপা হননি। কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন তিনি। তাঁর অপরাধ তিনি জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুই যুগের অধিক সশস্ত্র আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ চুক্তির পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেও আপোষহীনভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে শাসক-শোষকগোষ্ঠির সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অপরাধ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তিনি একজন নিবেদিত সৈনিক ছিলেন। এই অপরাধে দন্ডিত করে চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসীরা তাঁকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিলো। বিবেকবান তথা সচেতন মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন, এই অপরাধে যদি রাসেল ভাইকে হত্যা করা হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসীরা কোন শ্রেণীর স্বার্থ, কোন শাসকশ্রেণীর স্বার্থ আজ তারা লালন করে এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েছে? এই বিচারের ভার সচেতন বিবেকবান মানুষের কাছে ছেড়ে দিলাম।

জুম্ম জাতির শত্রুরা তাঁর বিপ্লবী কর্মকান্ডে ছিল ভীত সন্ত্রস্ত্র। পার্টির প্রতিটি নেতা-কর্মী হতে শুরু করে অঙ্গ-সংগঠনের কর্মীদের সাথে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ সদ্ভাব। মধুপুর এলাকায় সমস্ত পেশাজীবি মানুষের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সাহসিকতা এবং সাংগঠনিক কর্মকান্ডে শত্রুরা ছিল আতংকে। অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে মধুপুর এলাকায় তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। টানাপোড়েনের অভাবের সংসার হওয়া সত্বেও তিনি কোনদিন জাতির মুক্তি সংগ্রামের পথ থেকে পিছপা হননি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মুক্তিকামী জুম্ম জাতির অধিকার একদিন প্রতিষ্ঠা হবেই। আমি দেখেছি তাঁর মধ্যে কোন ক্ষমতা লোভ, অর্থ লোভ ছিলনা। বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি শুধু দু'মুঠো ভাত, ন্যূনতম খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলে আজীবন পার্টির কাজ চালিয়ে যাবেন এই দৃঢ়চেতনা তাঁর মধ্যে ছিল। চুক্তির পর থেকে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। পার্টির প্রতিটি কর্মকান্ডে একসাথে কতোবার অংশগ্রহণ করেছি তার ঠিক নেই। শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল পরিস্কার এবং আপোষহীন। শত্রুর কাছে তিনি কোনদিন মাথা নত করেননি। তাঁর সাহসিকতা এবং দৃঢ় মানসিকতার কারণে সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং চুক্তি বিরোধীরা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত্র। তিনি জানতেন একদিন মরতে হবে, সেই মৃত্যুর মধ্যে তিনি স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। শত্রুরা তাঁকে যমের মতো ভয় করতো, সেজন্য তিনি টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন।

ছাত্র সমাজের সাথে ছিল তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা। খাগড়াছড়ি শহরে মধুপুরে প্রতিটি পিসিপি কর্মীকে তিনি সাহস যোগাতেন। বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন, তিনি যেটুকু বুঝেন এবং যেটুকু জানেন। সেই কারণে মধুপুর এলাকার ছাত্র সমাজের মাঝে ছিলো তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। সার্বক্ষণিক কর্মী বলতে যাকে বুঝায় তার মধ্যে তিনি একজন। পার্টির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ তিনি করতেন না। তিনি এমনি একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য পার্টি কর্মী ছিলেন। পার্টির কাজে কোনদিন তিনি অপারগতা প্রকাশ করেননি। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে পার্টির প্রতিটি কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আমি দেখেছি পার্টির কাজ ছাড়া তাঁর জীবনে এক মুহূর্ত সময়ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেননি। প্রতিদিন তিনি পার্টি অফিসে আসতেন। মাঝে মধ্যে তাঁর একমাত্র আদরের সন্তান সোনামুনিকে অফিসে নিয়ে আসতেন। তাঁর সন্তানকে পার্টির প্রতিটি কর্মী আদর স্নেহ করতো। অফিসের বারান্দায় খেলা খেলতো তাঁর একমাত্র সন্তান। দাবাঘুটি নিয়ে খেলতো, ক্যারামে গিয়ে খেলতো। পার্টি অফিসে তাঁকে আর দেখা যাবে না, তাঁর সন্তানকে নিয়ে আসতে। চিরদিনের জন্য আসবেন না। অবুঝ শিশুটি এখনো জানে না তাঁর বাবা কোথায় চলে গিয়েছেন? ভোর হলে তার বাবাকে আর দেখবে না। রাত্রিতে তার বাবাকে আলিঙ্গন করে ঘুমাতে পাবে না। হয়তো তার মাকে এখনো বলে বাবা কোথায়? আসছে না কেন? বাবা আমার জন্য কিচ্ছু আনবে না? বাবার সাথে খাবো, বাবার সাথে ঘুরবো, বাবার সাথে পার্টি অফিসে যাবো, সোনামুনি তার মাকে মাঝে মাঝে হয়তো এমনিভাবে প্রশ্ন করবে। কিন্তু তার মা কি জবাব দেবে?

আমার মনে পড়ে প্রায় সময়ে সাইকেলে করে তাঁর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে অফিসে আসতেন। অফিস না খুললে পার্টি অফিসের সামনে তপনের চায়ের দোকানে অপেক্ষা করতেন। আমিও মাঝে মধ্যে সকাল ৯টার দিকে পার্টি অফিসে আসতাম, তাঁর সাথে দেখা হতো। এক সাথে চা নাস্তা খেতাম তপনের দোকানে। তাঁর আদরের সন্তানের সাথে দুষ্টামি করতাম। তাঁকে আর তপনের চায়ের দোকানে দেখা যাবে না। মিছিলের সামনের সারিতে তাঁকে আর দেখা যাবে না। কোন প্রোগ্রামে আর তাঁকে দেখতে পাবো না। চির জীবনের জন্য তিনি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলেন। চোখের পর্দায় আজো ভেসে উঠে তাঁর মুখচ্ছবি। খাগড়াছড়ি গেলে কি এক শূণ্যতা অনুভব করি। সাদামাটা একজন মানুষ ছিলেন তিনি। পার্টির প্রতিটি প্রোগ্রামে তিনি এমন পরিশ্রম করতেন যা অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। নিঃস্বার্থ একজন বিপ্লবী কর্মী ছিলেন তিনি। পার্টির প্রতিটি কর্মসূচীতে তাঁর প্রয়োজনীয়তা ছিল খুবই তীব্র। তাঁর মৃত্যুতে পার্টির অনেক ক্ষতি হয়েছে, যা পূরণ করার নয়।

জেলা কমিটিতে তিনি একজন অন্যতম নেতা। তারপরেও তিনি তপনের দোকান থেকে চা নাস্তা নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়াতেন। আমি দেখেছি তাঁর মধ্যে অহংকার নেই, তাঁর মধ্যে নেই কোন গৌরব। সত্যিকার একজন সাচ্চা বিপ্লবী কর্মী ছিলেন তিনি। আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি আন্তঃপার্টি সংগ্রাম এবং মতাদর্শগত সংগ্রামে তিনি ছিলেন সোচ্চার। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। জাতীয় বেঈমানদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিলো অত্যন্ত কঠোর। দালাল, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন একজন বিপ্লবী যোদ্ধা। তিনি প্রায়ই আমাকে একটি কথা বলতেন, আজ আমরা সংগ্রাম করছি সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, দালালরা ভোগ করছে। বাস্তবতা তাই বলে। বাস্তবতা যে বড়ই কঠিন এবং নির্মম তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। মাঝে মধ্যে একান্ত সান্নিধ্যে আমার সাথে আলোচনা করতেন, কি হবে আমাদের ভবিষ্যত, কি হবে জুম্ম জাতির ভবিষ্যত?

ঢাকার আদিবাসী প্রোগ্রাম থেকে ফিরে সেদিন মধুপুরে রাস্তার শেষ প্রান্তে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর সাথে আদরের সন্ত ান সোনামুনিও ছিলো, বিকেলে বের হয়েছিলেন ঘুরতে। সেইদিন তাঁর পার্টি জীবনে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের অনেক কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর কি অবস্থায় তাঁর পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, করুণ কাহিনীও শুনিয়েছেন। অভাবের মধ্যে থাকলেও নিদারুন কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করলেও তিনি কোনদিন বলেননি পার্টির কাজ আর করবেন না। এই একটা জিনিস আমি তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম, সংগ্রামে যে দৃঢ়তা এবং মনোবল একজন বিপ্লবী কর্মীর থাকা প্রয়োজন সেটা তাঁর মধ্যে ছিলো। পোড় খাওয়া কর্মী বলতে যাকে বুঝায় তিনি তার মধ্যে অন্যতম। সংগ্রামে তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনদিন পিছপা হননি। যেখানে সুবিধাবাদ প্রতিক্রিয়াশীল সেখানে তিনি রুঁখে দাঁড়িয়েছেন। যার কারণে চুক্তি বিরোধীরা তাঁর কর্মকান্ডকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। একটি নক্ষত্র জুম্ম জাতির ইতিহাসের বুক থেকে খসে পড়লো।

রাসেল এমন সাহসী বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন তিনি অন্যায়ের কাছে কোনদিনও মাথা নত করেননি। অভিভাবকের মতো ছাত্র সমাজের মাঝে থেকে তিনি কাজ করেছিলেন। মধুপুর এলাকার ছাত্র সমাজ তাঁকে সবাই বড় ভাই হিসেবে সম্বোধন করতো এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। ছাত্ররা তাঁর সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতো। তিনি যেটা সমাধান দিতে পারতেন না পার্টির উর্ধ্বতন নেতা এবং আমাকে বলতেন। আমি দেখেছি তাঁর মধ্যে কোন সততার ঘাটতি ছিলো না। পার্টির প্রতিটি কাজ নিজের কাজ বলে মনে করতেন। আমি দেখেছি পার্টির বড় বড় প্রোগ্রামে ১০ই নভেম্বর, ২রা ডিসেম্বর, কর্মী সম্মেলন, কংগ্রেস, অবরোধ, হরতাল, মিছিল, মিটিং কর্মসূচীগুলোতে সবচেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। পার্টির ছোট-খাটো কাজ হতে শুরু করে বড় বড় অনেক প্রোগ্রামে কাজগুলো

তিনি নিরলসভাবে করে যেতেন। অনেক সময় তিনি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে পার্টির কাজগুলো করতেন। পরিশ্রমী এবং ত্যাগী কর্মী বলতে যাকে বুঝায় তাঁর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

চুক্তির পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর তিনি নিজ আদি বাসস্থান খেয়াংঘাটে ফিরে যেতে পারেননি। চুক্তির পর হতে তিনি মধুপুর এলাকায় তাঁর নিকট আত্মীয় বাসার পাশে ছোট্ট একটি খুঁড়ে ঘরে বসবাস করে আসছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাসখানেক আগে সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে গিয়ে তল্লাশী করেছিলো। ভাগ্যক্রমে সেইদিন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। ঘটনার পরের দিন থানায় গিয়ে তিনি জিডি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিধান প্রশাসন করতে পারেনি। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তাঁকে চিরজীবনের জন্য বিদায় নিতে হলো। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গোটা পার্টি পরিবার শোকাহত মূহ্যমান। তাঁর যে আত্মত্যাগ, তাঁর যে অবদান আমরা চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো।

তিনি একজন সত্যিকার বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। তাঁর জীবনের আত্মবলিদান বৃথা যেতে পারে না। শহীদের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে যাবো। শোককে শক্তিতে পরিণত করে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবো। এক রাসেল আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে, হাজারো রাসেল পার্বত্য কোলে জন্ম নেবে। তাঁর অমর আত্মা তাঁর সংগ্রামী চেতনা আমাদেরকে আন্দোলিত করবে। আমরা নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য জন্ম নিয়েছি। শহীদের তালিকা দিনে দিনে লম্বা সারিতে গিয়ে পৌঁছবে। ঘাতকের আঘাতে আমাদের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের সংগ্রামী চেতনা তথা জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হতে পিছপা করা যাবে না। আমরা মহান এক আদর্শের ঝান্ডা বহন করে এগিয়ে চলেছি। আমরা অন্যায়-অবিচার মানি না। আমরা শোষণ, নির্যাতন মানি না। শাসন-শোষণের জিঞ্জির আমরা ভাঙবোই। আমাদের মাঝ থেকে প্রিয়জন, বন্ধু সহযোদ্ধা একে একে হারিয়ে যাবে। আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাওয়া বীর সেনানীদের পথ বেয়ে কঠিনতম সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরবোই। অন্যায়ের শক্তি যতই শক্তিশালী হোক একদিন পরাজিত হতেই হবে। আমরা ন্যায়ের পক্ষে লড়ছি। আমরা অবশ্যই জয়ী হবই। রাসেল ভাইও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। তিনি মরেও অমর। আমরা তাঁকে লাল সালাম জানাই। #

ছবিঃ ত্রিদিব শংকর তালুকদার রাসেল হত্যার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে সামিল হউন।
-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সমঅধিকার আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা

তনয় দেওয়ান

১

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪ দফা আন্দোলনের গতিবেগে সাম্প্রদায়িক, সামরিক ও শাসকগোষ্ঠীর আসনে কাঁপন ধরেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ আন্দোলনে তারা চরম আঘাত পেয়েছে। তাদের অসহিষ্ণু মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, এই বুঝি পার্বত্য চট্টগ্রামে লঙ্কাকান্ড ঘটাবে। নিজেদের বর্বর ও নৃশংস সাম্প্রদায়িক আর ফ্যাসীবাদী সামরিক চরিত্রকে লুকানোর জন্য তারা সমঅধিকারের চর্ম গায়ে জড়িয়ে রাজনৈতিক মাঠ/ রাজপথ গরম করতে চাচ্ছে। বিশেষ করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ জনসংহতি সমিতির আয়োজিত জনসভায় ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের গাড়ীবহরে হামলা করে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে তারা নিজেদের উলঙ্গ চরিত্রকে উন্মোচন করেছে। এ হামলা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকী সংসদে বলেন যে, ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে একদল সন্ত্রাসী ড. কামালের প্রাণনাশের জন্য তার উপর হামলা চালায়। এই বিষয়ে তিনি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে স্পীকার মহোদয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি উত্তরদানের আহ্বান জানান এবং কাদের সিদ্দিকীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, 'রাঙ্গামাটি জেলায় শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন'র কর্মসূচী চলাকালে ড. কামালের গাড়ী বহরের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে চুক্তিবাতিল দাবীকারীদের সংঘর্ষ হয়। কামাল হোসেনের সফরসঙ্গী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটির প্রবেশ পথে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট কর্মসূচী পালনকারী জনতার উপর হামলা করেছে। জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।' এছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে তথাকথিত চুক্তি হিসেবে অভিহিত করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিথ্যাচার এবং সমঅধিকার আন্দোলনের সাথে তার সখ্যতার প্রতিবাদ জানিয়ে কাদের সিদ্দিকী তৎক্ষণাৎ সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড. কামাল হোসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে দেওয়া বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে blatant lie (সর্বৈব মিথ্যা) বলে অভিহিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সন্ত্রাসীদের মদতদানে সহায়তা প্রদান বলে অভিহিত করে তার বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমঅধিকার আন্দোলনের বিষয়টি কেবল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও সামরিকবাহিনীর কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে না, এতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো আরও রাঘববোয়ালও রয়েছে। এখন দেখা যাক এই সমঅধিকার আন্দোলনকারী কারা?

২

সমঅধিকার আন্দোলনের প্রবক্তা হলো বরাবরের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার, জেনারেলরা। তারা হেডকোয়ার্টার থেকে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা অনুমোদন নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব কূটচাল বাস্তবায়ন করে থাকেন। বিগত সময়ে পার্বত্য গণ পরিষদ, বাঙালী গণ পরিষদ, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, পার্বত্য ছাত্র সংসদ বিভিন্ন নামে সংগঠন করে অর্থ ব্যয় করলেও সেগুলো তাদের মনঃপূত হয়নি বা তাদের স্বার্থসিদ্ধি সাধন করতে সমর্থ হয়নি। এসকল সংগঠন ছিল তিন জেলার সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে সঙ্গতিহীন। কাজেই ব্রিগেডিয়ার, জেনারেলরা চেয়েছিলেন নতুন নামে কিছু একটা করতে আর তাতে দরকার পড়ে একজন নেতার। সেই নেতা হলেন ওয়াদুদ ভূঁইয়া। এখন ওয়াদুদ ভূইয়া পুরনো নামের বিপরীতে একটি জমকালো নাম বেছে নিয়ে 'সমঅধিকার আন্দোলন' নামে সংগঠনটি গড়ে তোলেন। সমঅধিকার আন্দোলন নামক সংগঠনটির সাথে সমস্বার্থে জড়িত তিন পার্বত্য জেলার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কথায় আছে সব শেয়ালের এক রা। তাই তারা তিন জেলায় থাকলেও এবার এই সংগঠনের ব্যানারে সাময়িককালের জন্য হলেও সমবেত হয়েছে। তারা সমঅধিকার শব্দটি তাদের সংগঠনে জড়িয়ে দিয়ে মূলতঃ সাম্প্রদায়িক চরিত্রটাকে ঢাকার চেষ্টা করেছে। যদিও কুলা দিয়ে হাতি ঢাকা যায় না বলে আমরা জানি। কেননা গাধা বাঘের চামড়া গায়ে জড়ালেও গাধাই থেকে যায়। তাই তারা সাম্প্রদায়িক চরিত্র ঢাকতে গিয়ে সমঅধিকারের ধারণা নিয়ে সাধারণ সেটেলারদের নিজেদের স্বার্থের ঢাল বানিয়েছে। সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষে বুলি আওরাবার জন্য এই সংগঠনটিকে শক্তিশালী করলেন। সমঅধিকার আন্দোলন দাবী জানালো- পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকতে হবে। বাড়াতে হবে সেনাক্যাম্পের সংখ্যাও। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে যারা মগডালে চড়েন তারা তো সরকারী পদ, টেন্ডার-প্রকল্প হাতিয়ে নেয় কিন্তু সাধারণ সেটেলররা? তাদের সন্তুষ্ঠ রাখার জন্য আয়োজন করে সাম্প্রদায়িকতা আর তার বিনিময়ে সেটেলার বাঙালীরা লাভ করে জুম্মদের ভূমি বেদখল করার লাইসেন্স। এর মাধ্যমে তারা জুম্মদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে আর দখলকৃত ভূমিতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জোটবদ্ধতা প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাঙালীদের উপরও চাপ প্রয়োগ করে যেন তারা সংগঠিত হতে না পারে। কিন্তু স্থায়ী বাঙালীদের সংগঠন গড়ে উঠায় তারা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। বাংলাদেশসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা থাকায় তারা পাহাড়ী ছাত্রদের সমান্তরালে বাঙালী ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য প্রথমে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাহাড়ী কোটা বাতিল করে পার্বত্য কোটা প্রবর্তনের দাবী করলো। অবশ্য এ দাবী এরা অন্যান্য সংগঠনের নামে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করে আসছে। এরপর ওয়াদুদ ভূঁইয়ার আসন পাকাপোক্ত করা, সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য এই সমঅধিকার আন্দোলন নামক নতুন একটি ভূঁইফোঁড় সংগঠন জন্ম নিল।

৩

ব্রিগেডিয়ার, জেনারেলদের কথা বাদ দিলে 'সমঅধিকার আন্দোলন' হলো বিএনপি ও জামায়াত এর সাথে জড়িত সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের স্বার্থসিদ্ধির একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। একনজরে যদি সমঅধিকার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের তালিকা প্রণয়ন করি তাহলে দেখা যায় যে, জনৈক মনিরুজ্জামান মনির যিনি সমঅধিকার আন্দোলন এর সবক দিচ্ছেন তিনি মোটেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নন। তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন মুশফিকুর রহমান মারুফ। যিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন এবং বর্তমানে বিএনপিতে যোগদান করে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ক্যাডার হিসেবে নিজেকে সুপরিচিত করে তুলেছেন। বান্দরবানে যারা সমঅধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত তারা সবাই বিএনপি আর জামায়াতে ইসলামীর নেতা। যেমন ওসমান গণি- তিনি বিএনপি'র জেলা কমিটির সহসভাপতি। এডভোকেট মাহাতুল হোসেন যত্ন হলেন বিএনপি'র জেলা সাধারণ সম্পাদক। আব্দুল মাবুদ হলেন জেলা বিএনপি'র সহ-সাধারণ সম্পাদক। মো: মনির হলেন বিএনপি'র তরুণ দলের সম্পাদক ও বাঙালী গণ পরিষদের সভাপতি। আয়ুব চৌধুরী হলেন বিএনপি'র নেতা। এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ হলেন জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক। তাদের সাথে কমবেশী জড়িত বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মুজিবুর রহমান।

রাঙামাটিতে মশিউল আলম হুমায়ুন হলেন ওয়াদুদ ভূঁইয়ার এজেন্ট ও বিএনপির জেলা শাখার নেতা। যিনি সমঅধিকার আন্দোলনে রাঙামাটিতে কাজ করে চলেছেন। এখানে সমঅধিকারের গডফাদার হলেন পৌর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাবিব। এছাড়াও রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম- যিনি জামায়াতে ইসলামের রাঙামাটি জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক। রাঙামাটি পৌরসভার কমিশনার ও বিএনপি নেতা শহীদ চৌধুরী, বাঙালী গণ পরিষদের নেতা জালাল উদ্দিন আলমগীর, হারুন-অর রশীদ প্রমুখ। আর্থিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যারা পেছন থেকে রাঙামাটিতে কলকাঠি নাড়ছেন তারা হলেন আওয়ামী লীগের রাঙামাটি জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মতিন এবং জামায়াতে ইসলামীর জেলার আমীর শহীদুল্লাহ।

খাগড়াছড়ির নেতারা হলেন- মো. মাহফুজ ইসলাম, নুরুল আবছার, সাঈদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, জয়নাল আবেদীন, মোস্ত াফিজুর রহমান মিল্লাত, আব্দুস সালাম। রামগড় পৌর চেয়ারম্যান ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার বড় ভাই বেলায়েত হোসেন ভূঁইয়া, ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ভাইপো দাউদুল ইসলাম ভূঁইয়া যিনি মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার সঙ্গে জড়িত। মানিকছড়ি বিএনপি'র সভাপতি মো. করিম ও সম্পাদক এনামূল হক ভূঁইয়া, মাটিরাঙ্গা পৌর বিএনপি সভাপতি আবু ইফসুফ, সম্পাদক নুরুল আলম, পানছড়ি উপজেলার বিএনপি সভাপতি বেলাল মেম্বার প্রমুখ।

সমঅধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িতদের বক্তব্য দেখলে দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক- তারা মনে করে যে, চুক্তিতে জুম্মদের বেশী অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই চুক্তিকে বাতিল করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুই- চুক্তির আলোকে গঠিত জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যানের পদগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। তাহলে দেখা যায় যে, তারা মূলত: একদিকে চুক্তি বাতিল দাবীকারী এবং অন্যদিকে চুক্তির আলোকে গঠিত পরিষদ ও মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতারও ভাগীদার হতে চায়। এতে তাদের স্ববিরোধীতা স্পষ্ট।

তাদের শ্লোগানগুলো হলো- ১। সন্তু লারমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা ও সন্তু লারমাকে ফাঁসি দেয়া। ২। মনি স্বপন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় হতে অপসারণ করা। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল করা। ৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা ও সেনাক্যাম্প বৃদ্ধি করা। ৬। পাহাড়ী কোটা বাতিল করা ও পার্বত্য কোটা চালু করা। ৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহে চেয়ারম্যানের পদ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা। ইত্যাদি।

৪

বিগত '৯১ সালে নির্বাচনে জিতে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কি করেছিল? সেটা কি জুম্ম জনগণ ভূলে গেছে? আমি মনে করি- না। কেননা তা ভূলবার নয়। লোগাং গণহত্যা, নানিয়ারচর গণহত্যা এসব তো বিএনপি'র উপহার। তাই বর্তমান বিএনপির সাথে অতীতের বিএনপির কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয়না, মাত্রাগত তারতম্য বাদ দিলে। এই বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ভূঁইয়ছড়িতে সেটেলার গ্রাম সম্প্রসারণ করেছে, মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটিয়েছে। এসব কিছু প্রমাণ করে যে, বিএনপির সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, করতে চায় না। বরং বিগত সময়ের সামরিক ও সাম্প্রদায়িক নীতির স্থলে বর্তমানে ইউপিডিএফ দ্বারা সামরিক চাপ ও সাম্প্রদায়িক বিএনপির চেলাচামুন্ডাদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক চাপ রেখেই জুম্ম জনগণের ভাগ্যকে তিমিরে নিতে চাচ্ছে। বিএনপি তার জুম্ম বিদ্বেষী চরিত্র আর লুকাতে পারবে না।

আমরা যদি বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের কিছু পদক্ষেপ বিবেচনা করি তাহলে তাতে দেখতে পাবো যে, সরকারের কার্যক্রমেই মূলত: সমঅধিকার আন্দোলনের কার্যক্রম প্রোথিত।

যেমন-

১। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বয়ং পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা নিজ কব্জায় রেখেছেন। তিনি প্রথম জুম্ম অধিকার খর্ব করতে চুক্তি লংঘনকারী।

২। ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়ে সরকার ২য় বার চুক্তি লংঘন করেছে। এই ওয়াদুদ ভূঁইয়া নিজেকে খালেদা জিয়ার পুত্র হিসেবে পরিচয় দেন।

৩। খাগড়াছড়ি জেলায় মহালছড়ি উপজেলা সদরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করেছে, দাঙ্গায় দু'জনকে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে সাড়ে তিনশতাধিক জুম্ম বাড়ীঘর, ধর্ষণ করেছে ১০ জন জুম্ম নারীকে, জয়সেন কার্বারী পাড়া নামক জুম্ম গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে, তাদের ভূমি বেদখল করে সেটেলার গ্রাম সম্প্রসারণ করেছে। রাঙামাটি জেলার সুবলংএ গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করেছে। সমতল এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের বসতিস্থাপনে সার্বিক সহায়তা দিয়ে চলেছে।

৪। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ সেটেলার বাঙালীদের এখনও রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর না করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন না করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্ধ দেয়া হচ্ছে না।

৬। অপারেশন উত্তরণ নামে সেনাবাহিনীর সকল প্রকার নিপীড়ন, নির্যাতন ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তারা সড়ক ও জলপথে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশী অভিযান করে কেবলমাত্র জুম্মদের হয়রানি করছে। শান্তকরণ প্রকল্পের নামে দূর্নীতি করছে ও সেটেলারদের টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করছে।

৭। চুক্তিবিরোধী ও সন্ত্রাসী ইউপিডিএফকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

৮। সাম্প্রদায়িক সংগঠন সৃষ্টি, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাহাড়ী কোটা মেনে না চলা, জুম্মদের স্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রদান না করা প্রভৃতি কাজ করছে।

সরকারের উপরোক্ত কার্যক্রম হতে এটা স্পষ্ট যে, ওয়াদুদ ভূঁইয়ার কার্যক্রমের সাথে সরকারের কার্যক্রমে কোন বৈপরীত্য নেই। বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে ওয়াদুদ ভূঁইয়া সরকারের নীতিগুলোকেই বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

৫

উন্নযন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ওযাদুদ ভূঁইয়াকে বহাল রাখার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেলরা ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরা উঠেপড়ে লেগেছে। পেছনে অবশ্য বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সাম্প্রদায়িক অংশ। কথায় আছে ছাগল নাচে খুঁটির জোরে। আজকে এই সমঅধিকার নামক যারা লাফালাফি করছেন তাদের খুটি যে কোথায় এখন তা সকলের কাছে জানা হয়ে গেছে। জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের মুখে তারা সামরিক কৌশল এড়িয়ে সাম্প্রদায়িক কৌশল অবলম্বন করছে। তারা সরাসরি দাঙ্গা সৃষ্টি করছে না। তার অগে ইউপিডিএফকে দিযে বাঙালীদের খুন অথবা অপহরণ করার নাটক বানাচ্ছে তারপর তারা নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য জুম্ম জনগণের দুর্গতি সৃষ্টি করছে।

সমঅধিকার আন্দোলন নামক সংগঠনটি প্রথম আলোচনায় উঠে আসে জনসংহতি সমিতির কর্মসূচীর বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচী ঘোষণা করার মাধ্যমে। প্রশাসন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির আশংকা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে এরকম বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে সমঅধিকার আন্দোলন নামক সাম্প্রদায়িক ও ভূঁইফোঁড় সংগঠনটিকে হিরো বানিয়ে ফেলে। জনসংহতি সমিতি ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ দু'দিনব্যাপী হরতাল ঘোষণা করলে ওয়াদুদ ভূঁইয়া হরতাল প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। হরতাল পন্ড করার জন্য সমঅধিকার আন্দোলনকারীরা সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে রাঙামাটিতে হামলা চালায়। খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সশস্ত্র হামলা চালিয়ে একটি শিশুকে আহত করে। বান্দরবানে মীর নাছির নিজে উপস্থিত হয়ে হরতালকে বুড়ো আঙুল দেখান। এরপর জনসংহতি সমিতি ঘোষণা করে যে, ২৩ ফেব্রুয়ারী তারা রাঙামাটিতে একটি জনসভা করবে। এ নিয়ে তারা প্রশাসনের কাছে অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করে এবং প্রশাসন তা অনুমোদন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, কোন একটা দল কর্মসূচী ঘোষণা করলে অন্য কোন দল পাল্টা কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারবে না কিন্তু দেখা যায় যে, এই সমঅধিকার আন্দোলনের নেতারা এই জনসভাকে পন্ড করার জন্য খাগড়াছড়িতে ২২ ফেব্রুয়ারী, রাঙামাটিতে ২৩ ফেব্রুয়ারী ও বান্দরবানে ২৪ ফেব্রুয়ারী সড়ক অবরোধ ঘোষণা দেয়। যেন জনসংহতি সমিতির জনসভা পন্ড হয়। এব্যাপারে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে প্রশাসনকে জানানো হলে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি জানান বলে জানা গেছে।

জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের গতি দেখে বিশেষ করে ড. কামাল হোসেনের মতো জাতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও বামদলের রাজনৈতিক নেতারা জনসংহতি সমিতির সভায় যোগ দিতে আসার ঘটনায় ওয়াদুদ ভূঁইয়া খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা দেখতে পেল যে, এর মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির জনসমর্থন ও আন্দোলনের শক্তি ও বক্তব্য সাধারণ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার পরিবেশ

সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য তারা ড. কামাল হোসেনের সফর বিরোধী হয়ে উঠল। তারা ঘোষণা করলো যে, ড. কামাল হোসেনকে রাঙামাটিতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। যেকোন মূল্যে তাকে প্রতিহত করা হবে।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় যোগ দিতে আসার সময় রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার রাবারবাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে 'সমঅধিকার আন্দোলন' ও 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ' এর একদল সন্ত্রাসী গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন, গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় সদস্য খগেশ কিরণ তালুকদার, ওয়াকার্স পার্টির নেতা ডঃ আক্তার সোবহান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সাঈদুর রহমান, মানবাধিকার কর্মী নজরুল কবীর এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই প্রমুখ ব্যাক্তিবৃন্দের উপর হামলা ও প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর হামলার প্রতিবাদে জনসভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল রাঙামাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে ওয়াদুদ ভূইয়াকে উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণসহ ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতারের জন্য শ্লোগান দেয়া হয়। সমঅধিকার আন্দোলন নামধারী সাম্প্রদায়িক, চুক্তিবিরোধী ও সন্ত্রাসী সংগঠনটির সন্ত্রাসীরা কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা ও বাঙ্গালহালিয়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ২২টি বাস যোগে জনসভায় যোগ দিতে আসা লোকজনদেরকে বাধা প্রদান করে। তারা বরকল, বুড়িঘাট থেকে টেম্পোযোগে লোক আসার সময়েও বাধা প্রদান করে। ২৪ তারিখের হরতালের ঘোষণা দেওয়ার জন্য পিসিপি নেতা বিজক চাকমা ভক্তির নেতৃত্বে একদল পিসিপি কর্মী মাইকিং করার জন্য ২৩ তারিখ সন্ধ্যায় বেবীটেক্সীতে করে মাইকিং করছিল। তারা কাঠালতলী এলাকার ফিসারী ঘাটে পৌছুলে সমঅধিকার আন্দোলনের সন্ত্রাসীরা তাদের উপর ঢিল নিক্ষেপ করেছিল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী এই সম অধিকার আন্দোলনের হোতারা ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এই মামলায় জনসংহতি সমিতির আরও কয়েকজন নেতার নামও জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। জনৈক সেটেলার ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রাসী মাহফুজুর রহমান খাগড়াছড়ি পুলিশ থানায় এই মামলা দায়ের করেছেন। তারা মামলায় বলেছেন যে, জনৈক জাহাঙ্গীর আলম নামক যুবলীগের এক কর্মীকে দিয়ে জনসংহতি সমিতি ওয়াদদু ভূঁইয়াকে হত্যা করার পাঁয়তারা করছিল এবং এজন্য তারা একটি কিলিং স্কোয়াডও গঠন করেছে। অপরদিকে নক্ষত্রলাল দেব বর্মা, প্রবীণ চাকমা, অনিমেষ চাকমা নামের উচ্ছিষ্টভোগী দালালেরা ওয়াদুদ ভূঁইয়ার আসন ঠিক রাখার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে সরকারী বরাদ্ধকে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নামে বরাদ্ধ করছে। গড়ে তুলছে ওয়াদুদ পল্লী, ওয়াদুদ স্কুল।

৬

সমঅধিকার আন্দোলনের দাবী বা সূত্র ধরে যদি আমরা দেখি তাহলে তারা যেহেতু বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার দাবী করে তাহলে সমঅধিকার দাবী করা দরকার জুম্মদের তথা বাংলাদেশের আদিবাসীদের। কেননা বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের কোন স্বীকৃতি নেই আর বাংলাদেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং বাঙালীরা হলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু। জুম্ম তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠী ক্রমশঃ তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি। সমগ্র দেশের ১ শতাংশ জনসংখ্যাও নয় জুম্মরা। এই অতি অল্প সংখ্যক জুম্ম ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যুনতম অস্তিত্ব সংরক্ষণের অধিকারও তারা দিতে চাচ্ছেন না। আমরা জানি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সামরিকবাহিনী প্রধান এভাবে সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীরাই রয়েছেন। একজন জুম্ম বা আদিবাসী নেই। আর যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে সমঅধিকার দাবী করে তাহলে আমরা কি দেখতে পায়? আমরা দেখতে পায় যে, এখানে ঐতিহ্যগতভাবে তিনজন রাজা রয়েছেন। তাহলে কি বাঙালীদের মধ্যে থেকে তারা নতুন করে কাউকে রাজা বানাতে চান? ওয়াদুদ ভূঁইয়ার কি সে ধরণের খায়েশ রয়েছে? যদি অন্যান্য বিশেষ শাসন ব্যবস্থার আলোকে গঠিত প্রশাসনিক বিন্যাসগুলো দেখি সেখানে কি দাঁড়াচ্ছে? প্রথমেই দেখা যাক পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতির সংখ্যা কত? যদি হিসেব করি তাহলে পাই যে, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খুমী, লুসাই, পাংখো ও বাঙালী। তাছাড়াও সাঁওতাল, অহমিয়া, গোর্খা ও নেপালীরাও রয়েছেন।

এখন বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে আগে পাহাড়ী কোটাতে ১১টি জাতির জন্য মোট কোটা/ আসন ছিল ১২টি। সেটাতে বাঙালীদের জন্য ৩টি আসন রেখে পাহাড়ী অন্যান্য জাতিদের জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ৯টি। তাহলে মেডিকেলে যদি বাঙালীরা ৩টি কোটা পায় সেখানে অন্যান্য পাহাড়ী জাতিদের দিতে হবে মোট ৩৩টি। তাতেই সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে মেডিকেলে কোটা বন্টনে কারা বেশী অধিকার ভোগ করছে?

এখন আসা যাক আঞ্চলিক পরিষদের বেলায়। আঞ্চলিক পরিষদে মোট সদস্যা সংখ্যা ২১ জন এবং চেয়ারম্যান পদটি পাহাড়ীদের জন্য সংরক্ষিত। এখানে ২১টি সদস্য পদে বাঙালীরা একটি সংরক্ষিত আসনসহ মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৭ জন। বাকী ১৪ জন সদস্য হলো ১১টি জাতি থেকে। তাহলে এখানে যদি সমঅধিকার দিতে হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদে মোট পাহাড়ী সদস্য পদ হতে হবে ৭৭টি।

আর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপেদেষ্টা কমিটিতে বাঙালীদের জন্য ৩টি আসন রাখা হয়েছে। যদিও সেখানে পাহাড়ীদের জন্য কোন আসনই রাখা হয়নি। এখানে পাহাড়ীরা সমঅধিকার পেলে আসন পাবে ৩৩টি।

এবার আসা যাক জেলা পরিষদগুলো বিষয়ে। রাঙামাটি জেলা পরিষদে বাঙালী সদস্য সংখ্যা ১১ জন। সেখানে পাহাড়ী সদস্য সংখ্যা ২২ জন। তাহলে রাঙামাটি জেলা পরিষদে অপরাপর ৭টি পাহাড়ী জাতির জন্য আসন সংখ্যা হওয়ার কথা ছিল ৭৭টি। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে বাঙালীদের আসন সংখ্যা ১১ জন। সেখানে অপরাপর ৩টি পাহাড়ী জাতির আসন সংখ্যা মাত্র ২২। তাহলে সেখানে ৩টি পাহাড়ী জাতির জন্য আসন হওয়া উচিত ৩৩টি। তবেই সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। বান্দরবানে বাঙালীদের আসন সংখ্যা ১২টি। সেখানে অপরাপর ১১টি পাহাড়ী জাতির জন্য মোট আসন হলো ২২টি। তাহলে সেখানে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পাহাড়ীদের মোট আসন দিতে হবে ১৩২টি।

এখন দেখা যাখ প্রশাসনের প্রধান প্রধান পদগুলোর বিষয়ে। তিন জেলার ৩টি জেলা প্রশাসকই হলেন বাঙালী, ৩টি পুলিশ সুপার পদেও ৩ জন বাঙালী। সেনাবাহিনীর ৫টি ব্রিগেডে সবাই বাঙালী কমান্ডার। ২৪টি উপজেলায় সকল নির্বাহী কর্মকর্তারা হলেন বাঙালী আর ২৫টি পুলিশ থানায় সব ওসিরা হলেন বাঙালী। তবে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এসব প্রশাসনকি পদেও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাদবাকী পদের কথা উল্লেখ করলে তো তালিকাটা বিশাল লম্বা হয়ে পড়বে।

৭

এখন জনসংহতি সমিতি আন্দোলনে নেমেছে। কেননা তারা জানে যে, আন্দোলন ছাড়া কিছু হয়না। তাতে ঝোকের মুখে লবণ ছিটানোর মতো অবস্থা। ইউপিডিএফ বলেছিল, জনসংহতি বিক্রি হয়ে গেছে তারা আর আন্দোলন করতে পারবে না। এখন জনসংহতি সমিতি আন্দোলন করায় তারা পড়েছে বেকায়দায়। মিথ্যার বেসাতি করে জনগণকে ভোলানোর মন্ত্রটি আর চালানো গেল না বলে। আর ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক চক্র তো আরো বেশী বেসামাল। কারণ জনসংহতি সমিতির দাবীনামায় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। তাকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হতে হবে। তার পাশাপাশি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী থাকায় সেনাবাহিনীর লেজেও আগুন ধরেছে। তাই তারা চুপ থাকবে কেন? তাদের সহজ অস্ত্র হলো সাম্প্রদায়িকতা। যা আমরা প্রতিনিয়িত লক্ষ্য করছি। ওয়াদুদ ভূঁইয়া বা সেনাবাহিনী যতই ধূর্ত হউক না নে সাধারণ জনগণের কাছে তাদের চেহারা স্পষ্ট।

সমঅধিকার আন্দোলনকে আরেকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে জনসংহতি সমিতি তার নীতি কৌশল ঠিক করেছে বলে ধরা যায়। তারা জানে যে, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর স্বার্থে আঘাত হানলে এধরণের সংগঠন গজিয়ে তোলা হয় এবং আন্দোলন তীব্রতর হলে এরা বিলীন হয়ে যায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নেরর আন্দোলনকে প্রধান হিসেবে নিয়ে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। সেজন্য খাগড়াছড়িতে গিয়ে জোট সরকারের জনৈক মন্ত্রী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার গুণগান গাওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির বিষোদাগার করলেও ৮ ফেব্রুয়ারী বান্দরবান সফরকালে জনসংহতি সমিতির পূর্ব আহুত হরতাল থাকলেও সরকারের একজন মন্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে জনসংহতি সমিতি তার যাত্রাপথে কোনরূপ বাধাপ্রদান করেনি বরং সহায়তা করেছিল।

জনসংহতি সমিতির এই অন্দোলন মূলত: দীর্ঘদিন ধরে স্থিমিত হয়ে পড়া চুক্তি বাস্তবায়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা সচল করার আন্দোলন। কারণ জনসংহতি সমিত চুক্তি থেকে সরে যেতে পারে না। সামরিক শক্তি দিয়ে শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে ঠেকাতে চেয়েছিল। তারা সামরিকবাহিনী ও জুম্ম জনগণকে পরস্পরের দিকে বন্দুকের নল তাক করিয়ে যুদ্ধ করেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। এরপর তারা রীতিমত শান্তিবাদী সেজে গেল। শান্তিচুক্তির সময়ে সাদা পতাকা উড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এখন বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে পেয়ে আবার লেজ নাড়তে শুরু করেছে। তাই সমঅধিকারের নামে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য এই সমঅধিকার আন্দোলন সরকারের উচ্চ মহল থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

জুম্ম জনগণের জাতীয় উৎসব বিজু, সাংগ্রাইং, সাংগ্রং ও বৈসুর পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা, অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ করার দাবীতে আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মনে রাখতে হবে যে, সমঅধিকার আন্দোলন সমঅধিকার নাম দিলেও তারা যে জুম্মদের অধিকার বঞ্চিত রাখতে চায় এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালীদের বিপরীতে সেটেলার বাঙালীদের স্বার্থেই প্রতিনিধিত্ব করছে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। #

ক বি তা

দৃঢ় শপথ

পপেন ত্রিপুরা

কান্নাস্বরে নয়;
চিৎকারে- দৃঢ় চিৎকারে
হবে এ দাবীর শ্লোগান।
আবেদন নয়;
ছিনিয়ে নিতে হবে যুদ্ধ করে
এ হবে অধিকার আদায়ের যুদ্ধ।
দেয়াল কিংবা রাঙা পোষ্টার
অথবা-
ছেঁড়া ব্যানারে নয়;
এ দাবী বিশ্বজোড়া একটি অক্ষয় খাতায় লিখেছি
আমরা। এ দাবীর জন্য লড়েছি যুগ যুগান্তর।
কোমরে ব্যাল্ট আর চোখে চশমা নয়;
শকুনের দৃষ্টির মত লাল নীলে তাকাবো এবার
দুচোখ হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আর রগরগে লাল।
কোমর সাজাবো বুলেট প্যাকেটে-
হাতের মুঠোয় মৃত্যু আর চোখে আশার স্বপ্ন নিয়ে
ছুটবো এবার লড়বো এবার।
কপাল কব্জিতে লালসালু বেঁধে নয়;
এ কপালে পার্বত্যের মানচিত্র আঁকা হবে।
পার্বত্য নারীর বুকে ফুরফুরে ওড়না উড়বে না আর
ইজ্জতের ভয় যেথায় লুটোপুটি খায়
পাতলা ওড়নায় সেটা ঢেকে লাভ কি?
বুকে নয়; কোমরে বাঁধবে ওড়না
বুকে সাহস যুগিয়ে ওদের দেবে তাড়না।
হাতে আর ঘড়ি ঝুলানো হবে না-
সময় দেখে আর লাভ নেই-
এবার হবে মৃত্যু আর মৃত্যু-
লাশ আর লাশ শুধুই লাশ
কলমের কালিতে আর নয়;
বুকের তাজা রক্তে রাঙিয়ে দেবো রাজপথ।
সাগরের পানি আর নীল হবে না;
নীলাভ সাগরের পানির রং হবে
টকটকে লাল।
গাঢ় লাল রক্তে ভাসিয়ে দেবো-
মাইনী, কাচালং, চেঙ্গী, শঙ্খ কিংবা মাতামুহুরী।
নীলাকাশে আর পাখী উড়বে না;
নীলাকাশের রং পাল্টিয়ে যাবে
ধুসর কিংবা লালচে অথবা কালচে
ধোঁয়া শুধু ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হবে আকাশ
ছাই আর ছাই শুধু, ছাইয়ের খেলা হবে আকাশে।
মুখের হুমকিতে নয়;
এবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো
ধ্বংস করে দেব সব অশুভ শক্তিকে।
হে! যুবক ধৈর্য্য আর কত?
সমর সাজে সেজে রনাঙ্গনে এসো তুমি
সুখের শ্বেত পায়রা চিহ্নিত নিশান উড়াতে
এবার যুদ্ধ আর যুদ্ধ হবে
আকাশ ছুঁয়াবো নিশান
পার্বত্য হবে একটি নতুন পৃথিবী। #

আহবান

জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু

স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের কুশাসন, মৌলবাদের দাপটে
বিধ্বস্ত, অভিশপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম।
নিপীড়িত, নিঃগৃহীত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত,
অত্যাচারিত, প্রতারিত এই হেতুতে
বিপন্ন জুম্ম নারীত্ব যুগে যুগে।
কেবলই চতুর্পার্শ্বে, সামনে-পিছনে, ডানে-বামে রুদ্ধ পদচারণা।

দুঃখ-দৈন্য, দুঃশাসন আর মিথ্যাচার-অবিচার
পুরুষতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে কঠোর শাসনে শাসিত
পদদলিত, অবরুদ্ধ জুম্ম নারীর গণতন্ত্র।
বৃহত্তর সমাজ ও পারিবারিক সমাজ, রক্ষণশীল প্রভূত্ব
মৌলবাদ স্বধর্মের পবিত্র বাণী-
'পূর্ব জনমের কৃত কর্ম পাপের তরে নারী জনম'
যেন অবরুদ্ধ শহীদ মিনার।

স্বৈরাচারী প্রশাসন, আন্তর্জাতিক আক্রমণ, মৌলবাদ,
ধর্মান্ধ রীতিনীতি, সামন্ত ও বুর্জোয়া স্বল্প মানবতাবোধ,
সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্রের দাপট।
পবিত্র নারী শিশু পাচার, নিরাপত্তাহীন নারী জাতি-
রাজপুরীতে রাজা- মহারাজা, সম্রাট গোষ্ঠীর চিত্ত বিনোদন
আর ভোগ্যবস্তু অন্তপুরাবাসিনী।

নিরপেক্ষতা নয়, আর নয় নীরবতা
বিদ্রোহে, ক্রোধে মুক্তির তরে গর্জে উঠি এসো-
নারীবাদী নয়, নীরব ধিক্কার নয়,
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জানাই প্রতিবাদ-
লুণ্ঠিত অধিকার করতে উদ্ধার,
আদর্শ সমাজের অগ্রযাত্রায়। #

জুম্মদাহ কথা

অনির্বাণ

আমাকে যে হত্যা করেছিল সে ছিল একজন সাদামাটা বাঙালী। মুখে ছিল লম্বা গোঁফ-দাড়ি। মাথায় টুপিও ছিল একটা। হয়তো বাঙালীটি একটু অসুস্থ ছিল তবে আমাকে হত্যা করার সময় সে ছিল ভীষণ সাহসী আর অসীম শক্তিশালী। চারদিক থেকে গুলী করতে করতে আর্মীরা সারা গ্রাম ঘেরাও করেছিল। আর আমি, যখন ভগবান বুদ্ধ আর বনভান্তের নাম স্মরণ করতে করতে বাড়ীর পাশের জঙ্গলটাই লুকিয়েছিলাম তখন সে বাঙালীটা একটা বর্শা দ্বারা আমার পায়ে আঘাত করার পর বর্শাটা বুকে তাক করে আমাকে পাকড়াও করেছিল। তার চোখে ছিল হিংস্রতা আর নৃশংসতার নগ্ন রূপ যেন প্রতিটি চক্ষুই ছিল এক একটা অগ্নিকুন্ড। তার বর্শার মুখে আমার ভগবান আর বনভান্তে নিমিষেই উবে গেল কর্পুরের মতো। আমি দুহাত বাধা অবস্থায় সারা শরীরে লাঠি, কিল, ঘুষি খেতে খেতে কাঁঠাল গাছটার নীচে অন্যান্য আরও কয়েকজন হতভাগা জুম্ম নরনারীর ভয়ার্ত চোখের চোখাচোখি করে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম। তখনও বাঙালীটির হাতে দা, কুড়াল কিছুই ছিল না। বর্শাটাও মাটিতে রেখেছে গেড়ে। তবে সে ছিল শুধুমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষায়- নরক উৎসবে মেতে উঠতে।

আখতার, আখতার- বলে একজন আর্মী চেঁচিয়ে উঠলো আর শুণ্যে গুলী ছুঁড়লো। যখন চোখ মেললাম তখন দেখি- আমাদের বাম পাশের একজন পুরুষ আর একজন নারীর ছিন্ন মস্তক পড়ে আছে। তাদের দেহ দুটি লুটিয়ে পড়েছে। যদিও তখনো বাধা ছিল আমাদের সাথে। ছিন্ন মস্তক দুটিতে প্রচন্ড ঘৃণায় লাটি মেরে বাঙালীটি তার ঘৃণার শেষ অবশেষটুকুও চরিতার্থ করলো। এই হিংস্র বাঙালীটির নাম আখতার বলে মনে করতে আমার মৃত্যুমুখে পতিত মগজ ভূল করলো না। তখনও আখতারের হাতের রামদা ছিল টকটকে লাল রক্তে রঞ্জিত। দু'এক ফোঁটা রক্তও ঝরে পড়ছিল সেখান হতে।

আবারও প্রচন্ড গুলীর শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠলো আর অন্ধকার নেমে আসলো দুচোখে। যখন দুচোখ ঝাপসা ঝাপসা করে আলোর ঝিলিক পেল তখন আখতারের রক্তমাখা রামদাটি আমার একেবারে সম্মুখে। তার রামদাটি এখন আরও বেশী রঞ্জিত। তার কালো কালো লোমেও রক্তের ছোপ ছোপ ফোঁটা। আমার ঘাড়টি চরম দুর্বলতায় বামে ঘুরতেই আরও দুটি ছিন্ন মস্তক দেখলাম। কিছুক্ষণ আগে গুলী ছুঁড়বার আগেও আমি ঐ মস্তকগুলো থেকে নি:শ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তাদের চোখে মুখে দেখেছিলাম বাঁচার আকুতি। যদিও বাকহারা ছিল তাদের মুখ। বুকগুলো প্রচন্ডভাবে শ্বাস গ্রহণের কষ্টে উঠানামা করছিল। হাঁটু গেড়ে বসা থাকলেও তাদের সারা শরীর কাঁপছিল চলন্ত রেলের বগীর মতো।

আমার আর বাঁচার আশা ছিল না। আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো এখুনি অনিচ্ছাসত্বেও- এই ভেবে জীবনের সোনালী স্মৃতিগুলি মুহূর্তের জন্য ঢেউ খেলে যেতে লাগলো। আমি ভালবাসতাম পরানীকে। দু'জনে টিনটিলা কিয়ঙে ভগবান বুদ্ধের পাদদেশে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে কত কি প্রার্থণা করেছি। মোমের আলোয় পরানীর দুচোখের হাসির বন্যা প্লাবিত করতো আমার হৃদয় পুকুর। বাতাসের দোলে মুখে আচল হয়ে এলিযে পড়তো তার রেশমী চুলগুলো। পূর্ণিমা রাতে ভরা জ্যোস্নায় কালভার্টটির উপরে বসে থেকে হিসেব করেছি জীবনের স্বপ্নেরা কোথায় ভিড়বে। রাঙামাটি যাবার পথে লঞ্চের পেছনে বসে কাট্টলী বিলের নীলাভ পানি আর উজ্জ্বল রোদ্দুরকে স্বাক্ষী রেখে শপথ নিয়েছিলাম কখনো আলাদা হবো না। ৭ মে রাঙামাটি গিয়ে বনভান্তে কিয়ঙে পানীয় দেবো বলেও কথা ছিল আমাদের। তাইতো প্রতিদিন ক্যালেন্ডার উল্টাতাম আর তারিখ হিসাব করতাম। মুহূর্তে মনে পড়লো আজ সকালে জুহি চাওলার ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডারে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিলাম আজ মে মাসের ৪ তারিখ।

ফরিদ, ফরিদ বলে একজন আর্মী দক্ষিণের কোণা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো। তখন বুজে আসা চোখে ধুসর চাহনীতে দেখতে পেলাম যে, শুন্যে গুলী ছোঁড়া আর্মীটি অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। তার বন্দুকের নল থেকে তখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ফরিদ চলে যাবার সাথে সাথে আখতারও কিছুটা পেছনে সরে গেল আর তার রামদাটি গাছে কোপ মেরে রাখল। সাথে সাথে কিছুটা রক্ত মাটিতে ছিটকে পড়লো। আমার ডানপাশে অপর দুই দুর্ভাগা বন্দী ছিল। একজন পুরুষ। বয়স্ক। আর একজন নারী। অন্য কোন গ্রাম থেকে সদ্য বিয়ে হবার পর আমাদের গ্রামে আসা। শরীরে এখনও রোদেপোড়ার আঁচড় পড়েনি। এ মুহূর্তে আমি কাঁঠাল গাছটির মতো নিজেকে নিশ্চল বলে মনে করলাম। মাথাটি কিছুটা কাজ করলেও সমস্ত দেহটি ছিল নিথর, নিশ্চল। সম্ভবত: রক্তপ্রবাহ চলছিল থেমে থেমে লোকাল গাড়ীর মতো।

আখতার এবার আমাদের দিকে জোর কদমে আসতে লাগলো আর ফুটবল খেলার পেনাল্টি কিকের মতো করে আমার বুকে প্রচন্ড একটি লাটি মেরে বসলো। আশ্চর্য! আমি মুষড়ে পড়লাম না বরং শরীরে প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু তাতেই যেন বেশী করে নরককে

দেখতে চোখের দৃষ্টি মলিন থেকে স্পষ্ঠ হতে লাগলো। এবার আখতার গাছ থেকে রামদাটি নিয়ে আমার ডানপাশের জুম্ম ভাইটির ডানহাতে তীব্রবেগে কোপ মারলো। আমরা তিনজনেই স্প্রিং এর মতো সম্মুখে উল্টে পড়লাম দু'তিন কদম। অজ্ঞান জুম্মটির ছিন্ন হাতটি তখনও ছটফট করছিল। আর অজ্ঞান দেহটির প্রচন্ড দাপাদাপিতে আমাদেরকেও রক্তাক্ত করছিল। যদিও তখন আমার শরীর অন্যদের তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে। এরপর বুট জুতোর দুটো লাটি অনুভব করলাম আর সবকিছু নিস্প্রাণ হয়ে এলো।

নিস্প্রাণ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না। এটম বোমার প্রচন্ডতায় একজন নারীর চিৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। চোখের দৃষ্টি তখন ধুসর, ঝাপসা। মনে হলো কোনকিছু দিয়ে ঢাকা। এক পশলা নরকের হাওয়া এসে যখন দৃষ্টিটি স্পষ্ট করে দিল তখন দেখলাম জুম্ম মহিলাটির পিনোনটিই পড়ে আছে রক্তের সাগরে। মহিলাটির চিৎকার আর গোঙানীতে কেবলই মনে হতে লাগলো বুনো কুকুরের দল শিকারের উপর প্রচন্ড লোভাতুর কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

জুম্ম মহিলাটির চিৎকার প্রচন্ড থেকে প্রচন্ডতর হওয়ার সাথে সাথে আমার দৃষ্টি আর শ্রবণ শক্তিও বেড়ে যাচ্ছিল। আমি অসহায় দুগ্ধ শিশুর মতো দেখলাম- কয়েকজন সেটেলার বাঙালীর একজন জুম্ম মহিলার উপর পৈশাচিক শারীরিক ভোগ-বিলাস। একসময় মেয়েটির চিৎকার থেমে আসে। দুরে গুলীর শব্দও ভেসে আসছিল। মেয়েটির শেষ চিৎকারের সাথে সাথে আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

ফরিদ, ফরিদ বলে একটি ডাক আবার কানে ভেসে উঠলো। পেছন থেকে 'শালা' বলে একজন বাঙালী আবার আমার শরীরে প্রচন্ড গতিতে লাটি মেরে বসলো। আমিও নির্লজ্জের মতো আবার প্রাণ ফিরে পেলাম।

ধীরে ধীরে চোখ মেলতেই একদল হাত-পা, চোখ বাধা জুম্ম নরনারীর লাইন দেখতে পেলাম। কারো কারো শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। কারো শরীরে কোন কাপড়ই নেই বিশেষ করে মহিলাদের। তিনটি ৮/১০ বছরের মেয়ে শিশু। তাদের পড়নে নীল ফ্রক। সম্ভবতঃ স্কুলের পোষাক। তাদেরকে লাইন থেকে আলাদা করা হলো। রামদা হাতে সজ্জিত হলো আখতারসহ একদল নৃশংস বাঙালী।

'ওপেন ফায়ার' বলতেই ফরিদ এর সাব মেশিন গানটি গর্জে উঠলো। সাথে আরও কয়েকজন সিপাহীর। তাদের বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরুনোর সাথে সাথে জুম্মদের দেহ হতে প্রাণ উবে গেল। মৃত্যু নিশ্চিত করতে আখতার আর অন্যান্য সেটেলার বাঙালীরা সজোরে গলায় রামদা দিয়ে কোপ মেরে গেল। জুম্ম মেয়ে শিশুগুলোর তখনও জ্ঞান হারায়নি। তাদের চিৎকার থেমে গেছে। সম্ভবত: রক্ত চলাচলও থেমে গিয়েছিল। কিন্তু এবার আখতার আর অন্যান্য বাঙালীরা তিনটি জুম্ম মেয়ে শিশুকে নিয়ে প্রচন্ড ভোগ উল্লাসে মেতে উঠলো। কেউ ছিঁড়ছিল ফ্রক। কেউ শিশুগুলোর দুপা তীব্র বেগে ফাঁক করে নারীত্বে বসাচ্ছিল কামড়। কেউ বা সদ্য জেগে উঠা চরের মতো স্তনের উপর কামড় দিচ্ছিল। তখন কেন আমি বেঁচে ছিলাম- এই প্রশ্নটি করে মৃত্যুর উপর প্রচন্ড ঘৃণায় রাগ ঝাড়ছিলাম।

ফিরি-রি-ট। ফিরি-রি-ট। হুইশেলের শব্দ। এবার ফরিদ, আখতার আর আন্যন্য বাঙালীরা মিলে লাশগুলো এক জায়গায় জড়ো করা শুরু করলো। কেউ পা ধরে হেঁছড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ ছিন্ন মস্তকগুলোকে লাটি মেরে স্তুপের সাথে মিশে দিচ্ছে। তীব্র বেগে গড়িয়ে যাবার সময় ছিন্ন মস্তকগুলো থেকে তখনও রক্ত স্রোত ঝরে পড়ছিল। এবার রামদা হাতে আখতার আমার দিকে এগুতে লাগলো। অজান্তেই চোখ দুটো বুজে এলো। শালা, বলে আখতারের চিৎকারে মুহুর্তের জন্য চোখদুটো ঝলকে উঠলো। তখন লাকড়ি দিয়ে লাশের স্তুপ ঢাকা হচ্ছিল আর আর্মীরা পেট্রল ঢেলে দিচ্ছিল তাতে।

ডান হাতে রামদা আর বাম হাতে আমার মাথার ঝুটি ধরে টেনে হেঁচড়ে নিতে লাগলো আখতার। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ, বুনো পাখীর অশুভ ডাক শুনছিলাম আর গাছের পাতার ফাঁক গলে সূর্যের আলো চোখে লাগছিল। বাড়ী পোড়ার ফুং-ফাং শব্দ, বুটের ভারী শব্দ, সব কানে আসছিল আমার।

আখতার এবার রামদাটি আমার গলা ঘেঁষে নিয়ে গেল। দানবীয় তৃপ্তি তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো। লাশের স্তুপে লাকড়ী জড়ো করার টুকটাক শব্দও এখন থেমে গেছে। ফরিদ আমার দুই হাতে আর আখতার দুই পায়ে ধরে আমাকে গমের বস্তার মতো ছুঁড়ে মারলো লাশের স্তুপে। এবার পেট্রল ঢালা হলো আমার সারা শরীর জুড়ে। সরে যাওয়া লাকড়ীগুলো আরও জড়ো করা হলো। দাঁত খিচিয়ে ফরিদ লাইটার জ্বালালো আর ছুঁড়ে মারলো লাশের স্তুপে। মুহুর্তে অগ্নিপূজার মন্ডপে আমি জীবন্ত অথচ নিশ্চল পুড়ে যাবার জন্য চোখ মেললাম। তখনও আখতারের হাতে রামদা। সেখান থেকে ঝরে পড়ছিল রক্ত। আর আমি জীবন্ত দগ্ধ হতে হতে মৃত্যুপুরীতে পা রাখলাম। #

(লংগদু গণহত্যায় শহীদ জুম্মদের প্রতি উৎসর্গীকৃত)

জনসংহতি সমিতির ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচী বানচালের জন্য ইউপিডিএফ, ওয়াদুদ গং ও সেনাবাহিনীর একটি অংশের অপতৎপরতা

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' ও সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা, পার্বত্য চট্টগাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা ইত্যাদি দাবী সামনে রেখে ১৪-১৬ নভেম্বর ২০০৩ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মী সম্মেলন ২০০৩ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী আপামর স্থায়ী অধিবাসীগণ পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিগণও এই কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। এই কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে দৈনিক সংবাদ, প্রথম আলো, জনকণ্ঠসহ দেশের বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকসমূহে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঘোষিত দাবী অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট পত্রও প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ও খাগড়াছড়ির সাংসদ আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি জনসংহতি সমিতির ঘোষিত এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী বানচালের জন্য তারা তাৎক্ষণিকভাবে সড়ক অবরোধ ও হরতাল বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউপিডিএফ ও ওয়াদুদ গং-এর এই অপতৎপরতা সফল করার লক্ষ্যে যথারীতি প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়োজিত সেনাবহিনীর একটি অংশ অধিকতর তৎপর হয়ে উঠে। ফলে অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আক্রমণ অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৪-১৬ নভেম্বর ২০০২ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মী সম্মেলন এবং কর্মী সম্মেলনে গৃহীত ও ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচী বানচাল করার জন্য ইউপিডিএফ এই সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একটি অংশ এবং খাগড়াছড়ির সাংসদ আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক মহলের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইউপিডিএফ এই সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা অধিকতর পরিমাণে জোরদার হয়ে উঠে।

বিশেষ করে সেনাবাহিনীর একটি অংশ ও ওয়াদুদ গং বর্তমানে ইউপিডিএফ'কে সকল প্রকার সহায়তা দিয়ে সমিতির নেতা-কর্মী ও সমর্থক অপহরণ, হত্যা ও গুম ইত্যাদি নাশকতামূলক কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। অপরদিকে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ঠ বাঙালী গণ পরিষদ, নাগরিক ফোরাম, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, পার্বত্য ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ভূঁইফোঁড় সংগঠন এবং খাগড়াছড়ি জেলার চারদলীয় জোটের মাধ্যমে আবদুল ওয়াদুদ গং পাল্টা কর্মসূচী গ্রহণ করে জনসংহতি সমিতির ডাকা সড়ক অবরোধ ও হরতাল বানচালের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৩ নভেম্বর ২০০৩ জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমিতি যখন কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয় তখন উক্ত কর্মী সম্মেলন বানচালের জন্য ইউপিডিএফ গোপন সশস্ত্র কর্মসূচী গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচীর আলোকে খাগড়াছড়ির কতিপয় জায়গায় ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়।

উক্ত হামলার অংশ হিসেবে ৮ নভেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি কলেজ গেইটের সম্মুখে জনসংহতি সমিতির সমর্থক দোকানদার ধনমুনি চাকমা (২২)কে গুলি করে হত্যা করে। অপরদিকে একই দিনে মাটিরাঙ্গা উপজেলার বাল্যাছড়ি গ্রাম থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাইয়ের পিতা শশাঙ্ক ধামাই (৫৫)-কে অপহরণ করে। পরে মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়। ৯ নভেম্বর ২০০৩ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়ন থেকে জনসংহতি সমিতির সমর্থক হেমচন্দ্র কার্বারী (৫৫), প্রেম লাল চাকমা (৫২) এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানিক্য কার্বারীকে অপহরণ করা হয়। অপহরণের সময় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গ্রামে এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণ করে। অপরদিকে একই দিনে দীঘিনালার উল্টাছড়ি গ্রাম থেকে গ্রামের কৃষক অমর রতন চাকমা (২২)কে গুলি করে হত্যা করে।

জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে ১০ নভেম্বর ২০০৩ আয়োজিত স্মরণ সভায় দীঘিনালা থেকে যোগ দিতে আসার সময় খাগড়াছড়ির ধর্মঘর নামক স্থানে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বহনকারী পিকআপের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে সেবাব্রত চাকমা (২৬) নামে পিকআপের ড্রাইভার গুলিবিদ্ধ হয়। এছাড়া ঐদিন সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার দেওয়ান পাড়ায় হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা ৪টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং গ্রামে এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণ করে। উক্ত হামলায় জনসংহতি সমিতির সমর্থক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান প্রভাত কুমার চাকমার স্ত্রী সুনীতি দেবী চাকমা (৪০)-এর তলপেটে ও হাতে গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে জরুরী ভিত্তিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

কর্মী সম্মেলন শুরুর দিন ১৪ নভেম্বর ২০০৩ গভীর রাতে আনুমানিক ১২.৩০ ঘটিকায় সিজ চাকমা ও হৃদয় রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের এক সশস্ত্র দল রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙলতলী ও বাঘাইহাটের হাজাছড়া এলাকায় সশস্ত্র হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বঙলতলী গ্রামের অধিবাসী জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য দয়া মোহন চাকমা (৪৫) পীং ইত্তুক্যা চাকমা এবং সমর্থক জ্ঞানময় চাকমা (২২) পীং চন্দ্র মোহন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এছাড়া সেদিন ঐ গ্রামের ভালুক্যা চাকমার (৫৮) বাড়ী এবং উত্তর হাগালাছড়ার মনিষী চাকমা (৩২) পীং মিইল কুমার চাকমার দোকানঘর লুটপাট করে। অপহৃত এই ২ জনের আত্মীয়-স্বজন যোগাযোগ করতে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু ২ দিন পর তাদের ২ জনকে মৃত অবস্থায় হাজাছড়ার ঝিরির পাড়ে পাওয়া যায়।

বঙলতলী গ্রামে হামলার পর আনুমানিক রাত ৩.৩০ ঘটিকায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা বাঘাইহাটের হাজাছড়া গ্রামে হামলা চালায়। উক্ত হামলায় হৃদয় রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ইউপডিএফের সন্ত্রাসীরা প্রথমে গ্রামের ধন চাকমা (৩০) পীং কালী চরণ চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং পরে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাইবাছড়া নামক এলাকায় গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া হামলা শেষে চলে যাওয়ার সময় বাইবাছড়া গ্রামের রেবতি চাকমা (৫৫) পীং কৃপাসিং চাকমা এবং শুক্র রঞ্জন চাকমা (৫৫) পীং রজনী কুমার চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার পরদিন তাদের ক্ষতিবিক্ষত লাশ পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়।

অপরদিকে কর্মী সম্মেলনের শেষ দিনে জনসংহতি সমিতি (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২ ডিসেম্বর ২০০৩ তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ পালন করা এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করা; (২) ৩০ নভেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অপাসরণ করা না হলে তিন জেলাব্যাপী ৮ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করাসহ বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করা; (৩) ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং উক্ত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং (৪) ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নিয়োগ করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করা ইত্যাদি কর্মসূচী ঘোষণা করে।

উক্ত ঘোষণার পর ইউপিডিএফের নেতৃত্বের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৭ নভেম্বর ২০০৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ইউপিডিএফের নেতা প্রসিত বিকাশ খীসা জনসংহতি সমিতির ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি সতর্ক সমর্থন ব্যক্ত করেন। উক্ত সভায় বক্তারা জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে তাতে তারা পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অসম্পূর্ণ হলেও ইউপিডিএফ সমর্থিত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে জনসংহতি সমিতির ঘোষিত কর্মসূচীর সাথে একাত্ম ঘোষণা করছে এবং সমিতির পাশে থাকবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ নভেম্বর ও দৈনিক সংবাদ, ১৯ নভেম্বর দ্রষ্টব্য)। ইউপিডিএফের হাই কম্যান্ড থেকে জনসংহতি সমিতির ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচীকে সমর্থন করলেও মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচীর বিরোধীতা ঘোষণা করা হয়। একই দিনে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলায় ইউপিডিএফ সমর্থিত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একাংশ জনসংহতি সমিতির ঘোষিত কর্মসূচী সম্পর্কে বলা হয় যে, সন্তু লারমা এখন বেসামাল হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পাহাড়ী জনগণের সাথে বেঈমানী করা হয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ নভেম্বর দ্রষ্টব্য)। অপরদিকে খাগড়াছড়ি থেকে ইউপিডিএফের জেলা ইউনিট নেতা প্রদীপন খীসা ঘোষণা করেন যে, সরকারের দেয়া গদিতে বসে দাবীদাওয়া তোলা সন্তু লারমাকে মানায় না। এসব স্রেফ ধোঁকাবাজি (দৈনিক প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর দ্রষ্টব্য)। একই সাথে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালার বাবুছড়াস্থ ইউপিডিএফের সশস্ত্র ইউনিট থেকে অনিমেষ চাকমা ঘোষণা দেন যে, জনসংহতি সমিতির ঘোষিত কর্মসূচী কঠোরভাবে বানচাল করা হবে।

এভাবেই জনসংহতি সমিতির ঘোষিত কর্মসূচীকে নিয়ে ইউপিডিএফের মধ্যে একটা তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। ইউপিডিএফের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সংঘাত দানা বাঁধতে থাকে। হাই কম্যান্ডের ঘোষিত অবস্থানকে মাঠ পর্যায় থেকে তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

বিশেষ করে দীঘিনালার বাবুছড়া সশস্ত্র ইউনিট থেকে হাই কম্যান্ডের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নেয়ায় সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই আভ্যন্তরীণ কোন্দল এক পর্যায়ে সশস্ত্র সংঘাতে রূপান্তরিত হয় বলে অনেকের অভিমত এবং তারই ফসল ২ ডিসেম্বর ২০০৩ দীঘিনালার বাবুছড়ায় সংঘটিত হয় সশস্ত্র সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে ইউপিডিএফের কথিত স্থানীয় সামরিক নেতা জ্ঞানেশ্বর চাকমা চট্টগ্রামে নেয়ার পথে নিহত হন এবং ধ্রুবজ্যোতি চাকমা নামে একজন কেন্দ্রীয় নেতা এবং অন্তর বড়ুয়া নামে জনৈক কালেক্টর গুরুতরভাবে আহত হন।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ঐ বন্দুক যুদ্ধের পর আহতদের চিকিৎসার জন্য সেনা সদস্যরা ছিল খুবই তৎপর। প্রথমে তারা আহতদের বাবুছড়াস্থ স্থানীয় এমএসএফ-এর চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে তাদের উদ্যোগে আহতদের খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্মরত নার্স ও চিকিৎসকদের জরুরী চিকিৎসা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয় এবং বলে যে, আহতদেরকে যে কোন উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এঘটনার জন্য জনসংহতি সমিতিকে মিথ্যাভাবে দায়ী করে দীঘিনালা সেনানিবাসের জনৈক কম্যান্ডার জনসংহতি সমিতির দীঘিনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক বলভদ্র চাকমাকে শাসায়। উল্লেখ্য যে, ইউপিডিএফের উক্ত সশস্ত্র দলটি বাবুছড়া সেনা জোনের সন্নিকটে অবস্থান করে আসছে এবং সেনা জোনের পাশেই উক্ত সশস্ত্র সংঘাত সংঘটিত হয়।

বরাবরের মতো নিজেদের দুর্বলতা ধামাচাপা দেয়া এবং এটাকে ইস্যু করে জনমত বিভ্রান্ত করা, সর্বোপরি এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলা জায়েস করার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ এই সশস্ত্র সংঘাতের জন্য জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে এবং সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে। তারই প্রেক্ষিতে ৪ ডিসেম্বর ২০০৩ পানছড়িতে জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য ভ্রান্ত কুমার চাকমা ওরফে কিরণ ও ১৩ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির দপ্তর সম্পাদক ত্রিদিব শংকর তালুকদার ওরফে রাসেলকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। খাগড়াছড়ি শহরের কেন্দ্রস্থলে পানখাইয়া পাড়ায় ত্রিদিব শংকর তালুকদারের হত্যাকারী ছিল পিপু বৈষ্ণব নামে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার একজন ঘনিষ্ঠ ক্যাডার - যে আবার ইউপিডিএফের সাথেও কাজ করছে। আরো উল্লেখ্য যে, বাবুছড়া সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে মিথ্যাভাবে দায়ী করে ইউপিডিএফ ৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলায় সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। উক্ত হরতাল চলাকালে চারদলীয় জোট ও ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর ক্যাডাররা খাগড়াছড়িতে অবরোধের সমর্থনে ইউপিডিএফের পক্ষ হয়ে পিকেটিং করে।

৮ ডিসেম্বর হরতাল চলাকালে খাগড়াছড়ির জিরো মাইল স্থানে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা পিকেটারদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে পিতৃ-মাতৃহীন জুয়েল ত্রিপুরা (১০) গুরুতরভাবে আহত হয়। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩ সকালে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ইউপিডিএফের প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসাকে নিয়ে খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকায় চলে যান। এভাবেই এখন প্রসিত বিকাশ খীসা ও তার দল উগ্র সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি বিরোধী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও জুম্ম বিদ্বেষী সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষের সাথে একাট্টা হয়ে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২ ডিসেম্বর সড়ক অবরোধ ও ৮ ডিসেম্বর হরতাল পালনকালে বাধা প্রদানের অপচেষ্টা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২ ডিসেম্বর ২০০৩ সড়ক অবরোধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের দাবীতে ৮ ডিসেম্বর ২০০৩ হরতাল কর্মসূচী সফলভাবে পালিত হয়। ২ ডিসেম্বর সড়ক অবরোধ চলাকালে বান্দরবানের লামা ও আলিকদম উপজেলা ব্যতীত তিন পার্বত্য জেলায় সর্বত্র কোন যানবাহন চলেনি। এমনকি রাঙামাটি জেলায় কোন জলযানও চলেনি। লঞ্চ ও টেম্পু বোর্ট মালিক সমিতি অবরোধের সমর্থনে যান চলাচল বন্ধ রাখে। ৮ ডিসেম্বর হরতাল পালনকালে তিন পার্বত্য জেলায় দু'একটি স্থান ছাড়া সর্বত্র দোকানপাট বন্ধ থাকে। সরকারী-বেসরকারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক অফিসও বন্ধ থাকে। যে সকল অফিস-আদালত ও ব্যাংক খোলা ছিল তাতে জনসমাগম ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এবারের সড়ক অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচীতে জেলা ও উপজেলা সদরের সাধারণ লোকজনও পিকেটিং কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীরাও এই কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। কতেক ক্ষেত্রে স্থায়ী বাঙালী নারীরাও পিকেটিং-এ যোগদান করেন।

আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এবারে সড়ক অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচী বানচালের জন্য কখনো চারদলীয় ব্যানারে, কখনো পার্বত্য গণ পরিষদ, সর্বদলীয় বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, বাঙালী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি নামে সেটেলার বাঙালীরা অত্যধিক তৎপর ছিল। এক্ষেত্রে সেটেলারদের নানাভাবে সহায়তা প্রদান করে সেনাবাহিনীর একটি অংশ। ২ ডিসেম্বর সড়ক অবরোধ চলাকালে সকাল বেলায় ঢাকা থেকে ৪টি যাত্রীবাহী বাস নিয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল রাঙামাটি শহরে প্রবেশ করে। এতে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে

পড়ে। অপরদিকে রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় সেনাবাহিনীর স্কট দিয়ে লংগদু সদর থেকে মাইনী বাজার পর্যন্ত টেম্পো বোর্ট ও বেবীটেক্সী চালানো হয়। বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলায় সড়ক অবরোধ বানচালের জন্য চারদলীয় ঐক্যজোট ও বাঙালী গণ পরিষদের উদ্যোগে অবরোধ বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে ৮ ডিসেম্বর হরতাল চলাকালে দুপুর ৩টার দিকে শ'খানেক সেটেলার বাঙালী রাঙামাটি শহরের কাঠালতলী থেকে বনরূপার এলাকায় মিছিল সহকারে আসার চেষ্টা চালায়। এতে পিকেটারদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় সেটেলাররা বনরূপা পেট্রোল পাম্প মসজিদ থেকে পিকেটারদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এছাড়াও ঐদিন লংগদু উপজেলায় সেটেলার অধ্যুষিত মাল্যা নামক স্থানে আবদুল শহীদ মেম্বার ও মোঃ আবদুল হাকিম ওস্তাদের নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী মিছিল করে। ৮ ডিসেম্বর মারিশ্যা বাজারে হরতালের সমর্থনে দোকানপাট বন্ধ রাখার কারণে সেটেলাররা ৫/৬টি দোকান ভাঙচুর করে এবং পরদিন হরতাল সমর্থনকারী দোকানদার ও টেম্পু বোর্ট চালকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক মুচলেকা নেয়া হয় যে, পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতির হরতাল সমর্থন করলে ২,০০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

যদিও জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার পক্ষ থেকে পূর্ব থেকে হরতাল কর্মসূচী এবং সমাবেশের স্থান ও সময় ঘোষণা করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে বান্দরবান জেলা সদরে চারদলীয় জোট একই সময়ে একই স্থানে পাল্টা হরতাল বিরোধী সমাবেশের ঘোষণা দেয়। এতে করে জেলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় ৭ ডিসেম্বর বান্দরবান জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে এক সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। তাতে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, সকাল ১১টা পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি এবং বিকাল ২টা থেকে চারদলীয় জোট প্রেস ক্লাবের চত্বরে সমাবেশ করবে। জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে সমাবেশ শেষ করে প্রেস ক্লাব চত্বর ত্যাগ করা হলেও চারদলীয় জোটের তরফ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের ২ ঘন্টা আগে দুপুর ১২টায় প্রেসক্লাব চত্বর দখল করে হরতাল বিরোধী কর্মসূচী পরিচালনা করে। এভাবে চারদলীয় ঐক্যজোটের মদদে সেটেলার বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দাঙ্গা-দাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টা করে।

ঐদিন খাগড়াছড়িতে চারদলীয় ঐক্য জোটের ব্যানারে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সেটেলাররা সকাল থেকে হরতাল বিরোধী তৎপরতা চালায়। প্রথমে তারা খাগড়াছড়ি সদরের শাপলা চত্বর থেকে মিছিল বের করে জনসংহতি সমিতির অফিসের সামনে দিয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে আসে। অপরদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটেলাররা খাগড়াছড়ি বাজারের দোকানদারদের দোকান খুলতে বাধ্য করে। মহাজন পাড়া লাগোয়া দোকানপাট খুলতে দোকানদারদের বাধ্য করার এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির পিকেটারদের সাথে সেটেলারদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। বাজারে দোকানপাট খোলা থাকলেও লোক সমাগম ছিল একেবারে শূণ্য।

হরতাল চলাকালে তিন পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত তৎপর। তিন জেলা সদরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সবসময় যুদ্ধংদেহী অবস্থায় চলাফেরা করে। বাহ্যতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য এরূপ যুদ্ধংদেহী সতর্কতা হিসেবে এটা করা হলেও কার্যতঃ এটা হরতাল সমর্থনকারী জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালীদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে হরতাল বানচালের একটা অপচেষ্টা বৈ কিছুই নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সফরসঙ্গীদের উপর ওয়াদুদ গং-এর ন্যাক্কারজনক হামলা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পূর্ব ঘোষিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে আসার পথে গণফোরাম সভাপতি ও বরেণ্য আইনজীবি ড. কামাল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় সদস্য ও আদিবাসী বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক খগেশ কিরণ তালুকদার, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির অন্যতম নেতা ড. আক্তার সোবহান খান মাসরুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সাইদুর রহমানসহ মানবাধিকার কর্মী নজরুল কবীর এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাই প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের উপর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সীমান্তে কাউখালী উপজেলাধীন রাবার বাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' ও 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ' নামক নামসর্বস্ব ও উগ্র সাম্প্রদায়িক দু'টি সংগঠনের একদল সন্ত্রাসী পিকেটার কর্তৃক হামলা চালিয়ে তাদের গাড়ী ভাংচুর ও প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে হামলা করে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন; সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ; অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করার বিষয়সমূহের ভিত্তিতে চলমান গণতান্ত্রিক

আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রোজ সোমবার রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক জনসভার আয়োজন করে।

উক্ত জনসমাবেশ আয়োজনের লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন থেকে রাঙ্গামাটিস্থ জেলা জিমনিসিয়াম প্রাঙ্গণে জনসভা আয়োজনের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ঘোষণার পর এবং জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি গ্রহণের পর উক্ত জনসভা বানচালের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ির ক্ষমতাসীন দলের এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সরকারের একটি স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক মহল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' নামে একটি ভূঁইফোঁড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ব্যানারে পাল্টা কর্মসূচী হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলায় একই দিনে সড়ক অবরোধের কর্মসূচী ডাক দেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ চট্টগ্রামস্থ মেহেদীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলনের অনুষ্ঠিত সভায় এই ঘোষনা প্রদান করা হয়। এর পর পরই জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক সভায় কোন দলের ঘোষিত কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কোন পাল্টা কর্মসূচী আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন কর্তৃক ঘোষিত সড়ক অবরোধের ফলে যাতে জনসংহতি সমিতির জনসভায় লোক সমাগম ও যোগদানের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ পুলিশবাহিনীর এস্কট প্রদান হবে এবং এলক্ষ্যে সকাল ১০টা থেকে রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম জেলা সীমান্তে পুলিশবাহিনীসহ উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের অপেক্ষা করে থাকার কথা ছিল।

কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পুলিশবাহিনী বা কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রদান করা হয়নি। ফলে গণফোরামের সভাপতি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকরা রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে আসার পথে সকাল ১০.১০ ঘটিকায় রাবার বাগান নামক রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম জেলা সীমান্তে পৌছলে অবরোধকারী সেটেলার বাঙালীরা ট্রাক ও গাছ দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তাদের গাড়ী গতিরোধ করে। গতিরোধ করার পর ৩/৪ জন লোক এসে গাড়ীতে কে আছে জিজ্ঞাসা করে এবং ড. কামাল হোসেন রয়েছে উত্তর দেয়ার পর রাস্তার ধারে লুকিয়ে থাকা সেটেলাররা বের হয়ে এসে সংঘবদ্ধভাবে হামলা শুরু করে। ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সফর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ী গাড়ীর উপর লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তখন ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী মাইক্রো বাসের গ্লাস এবং আয়না ভেঙ্গে যায়। গাড়ীর দরজা খুলে ডঃ কামাল হোসেন ও তাঁর সফর সঙ্গীদের বের করার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় গাড়ী চালকরা বিচক্ষণতার সাথে গাড়ী পেছনে ঘুড়িয়ে ব্যাড়িকেড থেকে বেরিয়ে আসে।

মুখ্যতঃ গাড়ী চালকদের বিচক্ষণতা ও নেতৃবৃন্দের সাহসিকতার কারণে ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সফর সঙ্গীরা সেদিন প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনার ধরণ থেকে এটা নিশ্চিত যে, ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সফর সঙ্গীদের প্রাণনাশের লক্ষ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয় এবং অবরোধকারী সেটেলাররা যাতে সেই পরিকল্পনা অনুসারে সফল হতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও প্রশাসন ম্যাজিস্ট্রেটসহ পুলিশবাহিনীর এস্কট প্রদানে সচতুরভাবে বিরত থাকে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গত ১৪-১৬ নভেম্বর ২০০৩ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলন ২০০৩ থেকে উপরোক্ত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণার পর থেকে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সরকারের একটি স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক মহল জনসংহতি সমিতির উক্ত আন্দোলন কর্মসূচী বানচাল করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একটি অংশও নানাভাবে মদদ দিতে থাকে। পার্বত্য গণ পরিষদ, সচেতন নাগরিক ফোরাম, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ, সর্বদলীয় বাঙালী ঐক্য পরিষদ ইত্যাদি নানা ভূইফোঁড় ও নামসর্বস্ব সংগঠন এবং এমনকি খাগড়াছড়ি জেলার চারদলীয় জোটের নামেও আবদুল ওয়াদুদ গং জনসংহতি সমিতির ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচীর বিরোধীতা করতে থাকে। তাঁরই অংশ হিসেবে আবদুল ওয়াদুদের প্রত্যক্ষ মদদে এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন নামে আরেকটি নামসর্বস্ব সংগঠন আত্ম প্রকাশ করে। তারা ৯ দফা দাবী দিয়ে বাঙালীদের জন্য সমঅধিকার নাম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা, সন্তু লারমাকে অপসারণ, মনিস্বপন দেওয়ানকে অপসারণ, ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে স্বীয়পদে বহাল রাখা, বাঙালীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা প্রভৃতি দাবী করে। এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশের পর পরই চট্টগ্রামস্থ মেহেদীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ২২ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়, ২৩ ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ও ২৪ ফেব্রুয়ারী বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারই অংশ হিসেবে

পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক ২৩ ফেব্রুয়ারী ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং ড. কামাল হোসেন ও তাঁন সফরসঙ্গীদের উপর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে হামলা করে।

দেশব্যাপী ড. কামালসহ জাতীয় নেতাদের উপর হামলার নিন্দা প্রকাশ

জনসংহতি সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে ২৩ ফেব্রুয়ারী জনসভা হতে ড. কামালের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এই হামলার প্রতিবাদে জনসভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এছাড়া উক্ত হামলার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙামাটি জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল কর্মসূচী পালন করে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপি এক বিবৃতিতে ড. কামাল হোসেন ও তার সফরসঙ্গীদের উপর চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এই ন্যাক্কারজনক হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশের নাগরিকদের যেকোন স্থানে অবাধে চলাচল তার সাংবিধানিক অধিকার। নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানও সরকারে সাংবিধানিক দায়িত্ব। ড. কামাল হোসেন ও তার সফরসঙ্গীদের উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় প্রমাণিত হলো যে, বর্তমান সরকার জনগণের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার রক্ষা ও তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি আজ এতোই প্রবল যে, ড. কামাল হোসেনের মতো ব্যক্তিত্বকেও সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, যা দুঃখজনক। তিনি ড. কামাল হোসেনের গাড়ীবহরে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

ড. কামাল ও তার সফরসঙ্গীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে ১১ দলের এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ১১ দলের সমন্বয়ক খালেকুজ্জামান, রাশেদ খান মেনন, মঞ্জুরুল আহসান খান, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, দিলীপ বড়ুয়া, হাজী আব্দুস সামাদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিমল বিশ্বাস, বজলুর রশীদ ফিরোজ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে ঐক্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সামসুদ্দোহা, এ্যাড. ফজলুর রহমান, মফিজুল ইসলাম কামাল প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, এ হামলার ঘটনা দেশের বিরাজমান ক্রমাবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব প্রমাণ। দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেই এই হামলাসহ জোট সরকারের সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, দূর্নীতি ও দুঃশাসনের জবাব দেওয়া হবে।

সিপিবির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেছেন, ১১ দল নেতাদের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে এ হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। এর আগের দিন বিএনপির সাংসদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াসহ স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত নেতারা চরম উস্কানিমূলক ও সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছিল, ১১ দলের নেতারা রাঙামাটি আসলে তাদেরকে প্রতিহত করা হবে। এ হুঙ্কারের পর ১১ দলের পক্ষ থেকে পুলিশী নিরাপত্তা চাওয়া হলে সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্বেও তা দেওয়া হয়নি। এ থেকেই স্পষ্ট যে, এই জঘন্য হামলার নেপথ্যে সরকারের সুস্পষ্ট মদত রয়েছে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি বলেছে, এ হামলাকে পূর্বপরিকল্পিত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কেননা ওই নির্দিষ্ট জায়গায় পুলিশ প্রহরা থাকার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ প্রহরাতো দূরের কথা, সেখানে অবস্থান করছিল অস্ত্রধারী মাস্তানরা। তারা বলেন বিএনপি-জামাত সরকারের পৃষ্টপোষকতায়ই এই জঘন্য আক্রমণ সংঘটিত করেছে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)এর নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেছেন, দিনে দুপুরে ড. কামাল হোসেনের গাড়ীবহরের সন্ত্রাসী হামলার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো, জোট সরকারের হাতে পড়ে পুলিশ প্রশাসন ও কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে কতোটা অকার্যকর এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতোটা নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়েছে। বাসদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামানএক বিবৃতিতে বলেন, সরকারে সন্ত্রাস লালন পালন এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, সাধারণ মানুষ তো বটেই যারা জনগণের পক্ষ হয়ে লড়াই করছেন, তাদের জীবনও আজ নিরাপদ নয়। সাম্যবাদী দলের নেতা দিলীপ বড়ুয়া এক বিবৃতিতে বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিভূ সন্ত্রাসী গডফাদার ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে এই হামলা কাপুরুষোচিত এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ, জাতীয় জনতা পার্টি ও বাংলাদেশ যুব মৈত্রীর নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছে।

২৩ ফেব্রুয়ারী ড. কামাল হোসেনের উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ আইনজীবি সমন্বয় পরিষদ এর আহ্বায়ক ব্যারিস্টার আমী-উর-উল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ও সাহারা খাতুন। সদস্য সচিব এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। বাংলাদেশ জাতীয় আইনজীবি সমিতির এক সভায় ড. কামালসহ ১১ দলের নেতাদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবি সমিতি এক সভায় ড. কামালের উপর হামলার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। প্রগতিশীল আইনজীবি ফ্রন্ট ড. কামালের উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবি সহকারী সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় সমিতি ড. কামালের উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আইনজীবিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবি সমিতি ড. কামাল হোসেনসহ ১১ দলের নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশে করেছে। তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছে। তারা ২৫ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে আইনজীবিদের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী ঘোষণা করে। সে সাথে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করবে।

২৪ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলার কাউখালী থানায় ওয়াদুদ ভূইয়াসহ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য দ্রুত নিষ্পত্তি আইনে এই মামলা দায়ের করেন। চট্টগ্রাম জেলা বার এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নুরুল আবসার মামলার এফআইআর প্রদান করেন। ড. কামাল হোসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে দেওয়া বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রতিবাদ জানান। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে blatant lie (সর্বৈব মিথ্যা) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন।

রাঙামাটি জেলার জেলা প্রশাসক ড.জাফর আহমেদ খান ও পুলিশ সুপার হুমায়ন কবীর ২৩ ফেব্রুয়ারী ড. কামাল হোসেনসহ ১১ দলের নেতাদের ওপর হামলার ঘটনাটি রাঙামাটি জেলায় হয়েছে বলে বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ঘটনাটি রাঙামাটি জেলায় ঘটেনি। তাই এতে তার কোন দায়িত্ব পড়ে না। তারা মূলতঃ হামলার ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে ঘটনাটিকে স্রেফ সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে সাজাবার চেষ্টা করে।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর হামলার ঘটনার সাথে জড়িত শীর্ষ কয়েকজন সন্ত্রাসীদের নাম জানা গছে। যারা সবাই রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার সেটেলার বাঙালী। তারা হল-
১। মোঃ সৈয়দ, ৩৫, পীং-আবুল খায়ের, সাং- গুইফাতলা, বেতবুনিয়া, কাউখালী। তিনি প্রাক্তন ইউপি মেম্বার। এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত।
২। মোঃ মহিউদ্দিন, ৪৫, সাং- বেতছড়ি গুচ্ছগ্রাম, কাউখালী
৩। মোঃ নুরুল ইসলাম, ৪১, বেতবুনিয়া বাজার ফান্ড এলাকা, কাউখালী
৪। মোঃ অজিত্যা, ৪৬, বেতবুনিয়া হাই স্কুলের পার্শ্বে। সে পূর্বে পুলিশের চাকুরী করেছিল।
৫। মোঃ মনসুর, ২৮, পিতা- নুরুল আমীন (সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান), দাবন্যাছড়া, কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী
৬। মোঃ জাকের হোসেন, ৩৫, গোদারপাড়, বেতবুনিয়া
৭। মোঃ কালাম, ৩১, গোদাড়পাড়, বেতবুনিয়া। সে লাকড়ী ব্যবসার সাথে জড়িত
৮। মোঃ মোশাররফ হোসেন, ২৭, নতুন পাড়া আদর্শ গ্রাম, বেতবুনিয়া
৯। মোঃ গুটি কাশেম, ৩৫, বেতবুনিয়া বাজার এলঅকা, কাউখালী।
১০। মোঃ মঁতিন কাবারী, সাং- আমতলী, থানা- কাউখালী।

জনসংহতি সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিবাজ আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া তথা খাগড়াছড়ি জেলার চার দলীয় জোটের মদদে জনৈক মাহফুজুর রহমান কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও কয়েকজন ব্যক্তিসহ জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

জানা যায় যে, সেদিন ২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার লেলিয়ে দেয়া একদল সন্ত্রাসী কয়েকটি মোটর সাইকেল যোগে খাগড়াছড়ি শহরের ইসলামপুর নামক স্থানে গিয়ে জাহাঙ্গীর আলম নামে জনৈক ব্যক্তিকে কলাবাগানে ধরে নিয়ে আসে এবং বেদম মারধর শুরু করে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর আলমকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করার পর পরই ওয়াদুদ ভূঁইয়ার দক্ষিণহস্ত হিসেবে পরিচিত উল্লেখিত মাহাফুজুর রহমান কর্তৃক বানোয়াট কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। শুধু তাই নয়, সেদিন ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রসীরা কলাবাগান থেকে টিপু নামে জনৈক ছাত্রলীগের কর্মীকেও ধরে এনে মারধর করে।

অপরদিকে দায়েরকৃত মামলার আসামীদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করার জন্য খাগড়াছড়ির পুলিশ প্রশাসনের উপর ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও চার দলীয় জোটের পক্ষ থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। এলক্ষ্যে চারদলীয় জোট খাগড়াছড়ি সদরে বিক্ষোভ মিছিল করারও অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু খাগড়াছড়ি থানার এস আই খায়ের এজাহারে উল্লেখিত ব্যাক্তিদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং গ্রেপ্তার না করার কারণেই গত ২৯ ফেব্রুয়ারী রাতের মধ্যেই এস আই খায়ের-এর অন্যত্র বদলীর নির্দেশ আসে বলে জানা যায়।

রুজুকৃত এজাহারে বানোয়াট কাহিনী সাজানো হয় এভাবে - সেদিন ২৮ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টার দিকে নাকি জাহাঙ্গীর আলম নামে জনৈক ব্যাক্তিকে ওয়াদুদ ভুঁইয়ার কলাবাগানস্থ বাসভবনের আশেপাশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘোরাফেরার সময় স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসবাদের এক পর্যায় সে স্বীকার করে যে, জনসংহতি সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি'কে হত্যার জন্য সে স্থান চিহ্নিত করতে এসেছে। স্থানীয় জনসংহতি সমিতির নেতা সুধাকর ত্রিপুরা সন্তু লারমার নির্দেশে প্রথমে তাকে রিক্রুট করে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এজাহারে আসামী হিসেবে জাহাঙ্গীর আলম, সুধাকর ত্রিপুরা, কৈলাশ ত্রিপুরা, কবি রঞ্জন ত্রিপুরা, যতীন ত্রিপুরা ও ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা প্রমুখ মোট ৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও আওয়ামী লীগের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলমকেও হত্যার নির্দেশকারী হিসেবে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। বলাবাহুল্য যে, এজাহারে উল্লেখিত বানোয়াট কাহিনী পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাব (২৯/০২/০৪), দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ (১/৩/০৪) ও দৈনিক গিরিদর্পণে (১/৩/০৪) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার করা হয়।

বস্তুতঃ এজাহারে উল্লেখিত বানোয়াত এবং উল্লেখিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও তাঁর সন্ত্রাসী গংদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতেই এভাবে কল্পনাপ্রসূত কাহিনী সাজানো হয় এবং চিহ্নিত কতিপয় সংবাদদাতার মাধ্যমে উল্লেখিত দৈনিকসমূহে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়।

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ঘোষিত গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন কর্মসূচী বানচাল করার লক্ষ্যেই উগ্র সাম্প্রদায়িক আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া ও খাগড়াছড়ি জেলার চারদলীয় জোটের একাংশ জনসংহতি সমিতির কয়েকজন কর্মীসহ সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। আর উক্ত ষড়যন্ত্রের বর্ধিত অংশ হিসেবেই মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনার সংবাদ স্থানীয় একটি সংবাদদাতা চক্রের মাধ্যমে চিহ্নিত কয়েকটি সংবাদপত্রে ফলাওভাবে প্রচার করা হয়।

৮ মে হরতাল পালনকালে বান্দরবানে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলা

পূর্বে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে ৮ মে হরতাল কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালনকালে বান্দরবান জেলা সদরে চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মী এবং নিরীহ পাহাড়ীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। এই সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্বদানকারী ও উস্কানীদাতাদের মধ্যে যাদেরকে চিহ্নিত করা হয় তারা হল- (১) হাফেজ মোঃ আজিজুল হক, চারদলীয় ঐক্যজোট তথা স্থানীয় জামাত নেতা ও ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদপ্রার্থী, (২) মনির হোসেন, সম অধিকার আন্দোলনের নেতা, (৩) আবদুল মাবুদ, যুবদলের জেলা সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক, (৪) মোহাম্মদ ইলিয়াছ, গণপরিষদ নেতা ওসমান গণির ছোট ভাই, (৫) মোঃ মোস্তফা, (৬) নূরে আলম, (৭) কামাল হাশেম ও তার পিতা (৮) আহমদ হাশেম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সেদিন দুপুর প্রায় ১২ টায় বান্দরবান জেলা সদরস্থ কে এস প্রু মার্কেটের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং এর সময় উক্ত সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে লাঠিসোটা ও কিরিচসহ জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের উপর এই ন্যাক্কারজনক হামলা শুরু করে। সাথে সাথে তারা প্রেসক্লাবের সামনে ও কোর্ট বিল্ডিং এলাকায়ও পাহাড়ীদের উপর চড়াও হয়। এসময় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি থানা যুব সমিতির সদস্য সচিব নিরলাল তঞ্চঙ্গ্যা (২৪) পীং- বিমল তঞ্চঙ্গ্যা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদর থানা সদস্য উচ্ছা মারমা (২২) পীং অংইয়ো মং মারমা হামলাকারীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন। এসময় হামলাকারীরা অগ্রণী ব্যাংকসহ পাহাড়ীদের বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙচুর করে। এর পরপরই হামলাকারীরা পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় ছাত্রাবাসেও হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাট চালায়। এতে বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র উথোয়াই চিং মারমা (১৬) পীং মংক্যঅং মারমা, ডনবসকো উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র নিংথোয়াই অং মারমা (১৬) পীং মংহ্লাপ্রু মারমা ও একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র জোসেফ ত্রিপুরা (১৬) পীং পদ্মমনি ত্রিপুরা নামে তিন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের সবাইকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক হরতাল কর্মসূচীতে বান্দরবানে উক্ত হামলাকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানানো হয় এবং উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তারপর দিন ৯ মে ২০০৪ তিন পার্বত্য জেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়।

খাগড়াছড়িতে সেনা ও পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতি এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে হামলা

গত ২৫ মে ২০০৪ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন গুইমারা আর্টিলারী ব্রিগেড নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুকছড়ি সেনা ক্যাম্প কর্তৃক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৭ জন কর্মীকে বিনা কারণে ঘুমন্তাবস্থা থেকে গ্রেপ্তার, সেনা ক্যাম্পে আটক, ইলেক্ট্রিক শক দেয়া, শরীরে সূঁই ফুটানো, উল্টো করে গাছে ঝুলানো ইত্যাদি মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিক নির্যাতনের ফলে তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনসহ সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অধিকন্তু গ্রেপ্তারকৃত উক্ত কর্মীদের মুক্তির দাবীতে গত ২৭ মে তিন পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী চলাকালে পুলিশ ও সেনা সদস্য কর্তৃক জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হামলা এবং জনসংহতি সমিতির জেলা শাখার সভাপতি ও একজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ৩৩ জন নেতা-কর্মী ও সাধারণ পথচারী গ্রেপ্তারের ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে।

সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় গুইমারা এলাকায় সফররত জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীদের উপর সেনা নির্যাতনের ফলেই এই বিক্ষুব্ধ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। বস্তুতঃ গুইমারা এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের অব্যাহত চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা ও শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অতি সম্প্রতি গণবিস্ফোরণ ঘটে। ফলে গত ২৫ এপ্রিল স্থানীয় জনগণ ইউপিডিএফ'কে লিখিত মুচলেকা দিতে বাধ্য করে এই মর্মে যে, ইউপিডিএফের সদস্যরা অত্র এলাকার জনগণের উপর নির্যাতন, অপহরণ ও মুক্তিপণ এবং হুমকি প্রদান করবে না। এমতাবস্থায় ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে চলমান জনরোষ রোধ করতঃ ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র শক্তিকে সংহত করে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া এবং রাজনৈতিকভাবে জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বানচাল করার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীর একাংশ গুইমারা এলাকায় জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের উপর এই দমনমূলক অভিযান চালায়।

হামলার সূত্রপাত

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীরা সাংগঠনিক সফরের উদ্যোগ নেয়। স্থানীয় কর্মীসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা এই সাংগঠনিক সফরে অংশগ্রহণ করে। সফর সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে অবহিত করা হয়।

কিন্তু গত ২৫ মে ২০০৪ ভোর ৫.০০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা আর্টিলারী ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পের লেঃ কর্ণেল আবদুর রউফ ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাহ্তাবউদ্দিন-এর নেতৃত্বে ১২ ইঞ্জিনিয়ার কোরের একদল সেনা জনসংহতি সমিতির গুইমারা অফিস সংলগ্ন বাড়ী থেকে সাংগঠনিক কাজে সফররত পিসিপি, যুব সমিতি ও জনসংহতি সমিতির নিম্নোক্ত ১৭ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ঃ

১। মংথোয়াই মারমা (২৮) পীং তুফান মারমা, ছোট পিলাক, গুইমারা (পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী জেএসএস সদস্য)
২। আলো বিকাশ চাকমা (২২) পীং মঙ্গলচন্দ্র চাকমা, বাদশাছড়ি, দীঘিনালা (সাংগঠনিক সম্পাদক, পিসিপি বেতছড়ি শাখা)
৩। সুনীল কান্তি চাকমা (২২) পীং স্নেহ কুমার চাকমা, বেতছড়ি, দীঘিনালা (সাধারণ সম্পাদক, যুব সমিতি, দীঘিনালা শাখা)
৪। তাতু ত্রিপুরা (২৩) পীং তরং কুমার ত্রিপুরা, হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির গ্রাম শাখা)
৫। মিস্টা রঞ্জন ত্রিপুরা (২৪) পীং নগেন্দ্র ত্রিপুরা, হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির গ্রাম শাখা)
৬। সুকুমার চাকমা (২০) পীং নয়নচন্দ্র চাকমা, বেতছড়ি, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির বেতছড়ি গ্রাম শাখা)
৭। অমর চাকমা (৩০) পীং বিমা রঞ্জন চাকমা, কবাখালী, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির গ্রাম শাখা)
৮। বলি ত্রিপুরা (২২) পীং কলিঙ্গ ত্রিপুরা, হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির গ্রাম শাখা)
৯। শান্ত চাকমা (২২) পীং অজয় চাকমা, বোয়ালখালী, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির বেতছড়ি গ্রাম শাখা)
১০। সোহাগ চাকমা (২০) পীং স্নেহ কুমার চাকমা, হাজাছড়ি, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির গ্রাম শাখা)
১১। সুমেধ চাকমা (২৫) পীং মৃত কিশু সেন চাকমা, বেতছড়ি, দীঘিনালা (সদস্য, যুব সমিতির বেতছড়ি গ্রাম শাখা)

১২। উজাই মারমা (৩৫) পীং মৃত মং মারমা, হেডম্যান পাড়া, গুইমারা (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)
১৩। রূপায়ণ চাকমা (২৬) পীং হালেশ চন্দ্র চাকমা, পরশুরামঘাট, গুইমারা (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)
১৪। সাগর বাদশা চাকমা (২২) পীং পূর্ণ কান্তি চাকমা, কুমুজ্যা পাড়া, রামগড় (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)
১৫। মংচাই মারমা (২৫) পীং অংগ্রু মারমা, ছোট পিলাক, রামগড় (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)
১৬। দেবময় চাকমা (৩২) পীং হৃদয় মুনি কার্বারী, বড় পিলাক, রামগড় (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)
১৭। অন্তর ত্রিপুরা (১৬) পীং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, শিংগলি পাড়া, রামগড় (সদস্য, জেএসএস গুইমারা থানা শাখা)।

জনসংহতি সমিতির আহ্বান ও সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পে গ্রেপ্তারকৃতদের নৃশংস নির্যাতন

২৬ মে-এর মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের মুক্তির জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় ২৭ মে থেকে তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধের ডাক দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু গ্রেপ্তারকৃত উল্লেখিত কর্মীদের মুক্তির লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সেনা, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে। গুইমারা ব্রিগেড থেকে রক্তোৎপল ত্রিপুরাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করা হয় যে, গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং কোনরূপ মারধর করা হবে না। কিন্তু তারপর দিন ২৬ মে গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের মুক্তি না দিয়ে মারাত্মক জখম অবস্থায় গুইমারা থানায় সোপর্দ করা হয় এবং গুইমারা থানার সাধারণ ডায়েরী নং ১০৭ তারিখ ২৬/০৫/২০০৪ মূলে কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সেদিনই জেলা আদালতে তাদেরকে হাজির করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের আদালত থেকে জামিন নেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আদালত জামিন না মঞ্জুর করেন। গ্রেপ্তারকৃতদের জামিন না দেয়ার জন্য পেশকৃত এজাহারে উল্লেখ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের জামিন দেয়া হলে গুইমারা এলাকায় শান্তি বিঘ্ন ঘটবে বলে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে বলা হয় যে, **"যৌথ অভিযান পরিচালনা করিবার সময় আসামীরা জংগলে দৌঁড়াদৌড়ি করিবার সময় সেনাবাহিনীর সহিত ধস্তাধস্তিকালে আসামীরা সামান্য জখমপ্রাপ্ত হইয়াছে।"** গ্রেপ্তারের সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের কাছে দেশীয় তৈরী রাম দা ৫টি, ছোড়া ১টি, কুড়াল ১টি এবং দা ১টি উদ্ধার করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ এজাহারের উল্লেখিত বয়ান সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কেননা কোন জঙ্গলে নয়, তাদেরকে ঘুমানোর সময় গুইমারা সদরের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির গুইমারা কার্যালয়ের পাশের একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বস্তুতঃ সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের নির্যাতনের ফলেই তাদের শরীরে জখম হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিবৃন্দ জানান যে, সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর হাত-পা বাধা ও চোখ বাঁধা অবস্থায় প্রথমে সকলকে এক জায়গায় রাখে। তারপর সেখান থেকে দু'তিনজনকে পৃথক পৃথক জায়গায় নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এভাবে সকল সদস্যদের উপর দফায় দফায় ঐদিন সারাদিন ও সারারাত নির্যাতন করা হয়। গ্রেপ্তারের পর থেকে কোন খাদ্য, এমনকি পানের জন্য পানি পর্যন্ত দেয়া হয়নি। হাত-পা ও চোখ বাঁধা অবস্থায় লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে মারধর করা, বুট দিয়ে লাথি মারা ও শুইয়ে শরীরের উপর নাচা, পায়ে রশি বেঁধে গাছে ঝুলানো ও পিটানো, চোখ খোলা রেখে একনাগারে সূর্য দেখতে বাধ্য করা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইনজেকশনের সূই ফুটিয়ে দেয়া ও বিদ্যুতের শক দেয়া ইত্যাদি মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালানো হয়। শুধু তাই নয়, সুমেধ চাকমা ওরফে সুমেশকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে যৌন নির্যাতন চালানো হয়। তার গায়ের রং ফর্সা এবং কোমল ছিল বলেই সেনা সদস্যরা যৌন হয়রানি করে। গুইমারা থানায় সোপর্দ করার সময় সেনা সদস্যরা গ্রেপ্তারকৃতদের নির্দেশ দেয় যে, তারা যেন ক্ষমতাসীন এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশমত কাজ করে। কাজ করলে তারা মোটা অংকের টাকা পাবে। অন্যথায় আরো বিপদ হবে বলে সেনা সদস্যরা হুমকি দেয়। উল্লেখ্য যে, এই ক্যাম্পে কর্তব্যরত সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে অহেতুক নিরীহ পাহাড়ীদের উপর হয়রানি ও অত্যাচারের অভিযোগ আছে।

তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে ২৬ মে বিকালে জনসংহতি সমিতির গ্রেপ্তারকৃত উল্লেখিত কর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবীতে তিন পার্বত্য জেলায় ২৭ মে হতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ভূত সমস্যাটি মীমাংসার উদ্যোগ নেয়া হয় ২৬ মে রাত্রে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত ২৭ মে অপরাহ্ন ২.০০ ঘটিকার মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের জামিনে মুক্তি দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে জানানো হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেয়া হয় যে, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির সাথে সাথে অবরোধ কর্মসূচীও প্রত্যাহার করা হবে।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে আকস্মিক হামলা ও নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার

কিন্তু মুক্তির কোন উদ্যোগ না নিয়ে হঠাৎ করে অপরাহ্ন ১.৩০টার দিকে খাগড়াছড়ি থানার ওসি আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হানা দেয়। পুলিশ ও সেনা সদস্যরা অফিসের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় পুলিশ ও সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের লাঠি ও বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করতে করতে গাড়ীতে তুলে। এছাড়া সেনা ও পুলিশ সদস্যরা খাগড়াছড়ি সদরস্থ মহাজন পাড়ায় হামলা চালায়। হামলাকালে তারা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। সেনা ও পুলিশ সদস্যরা মহাজন পাড়ায় জুম্মদের ঘরবাড়ী তল্লাসী ও তছনছ করে পিসিপি ও জনসংহতি সমিতির কয়েকজন সদস্য এবং সাধারণ পথচারীকে গ্রেপ্তার করে। এসময় রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করতে করতে সুমন চাকমা ও প্রত্যয় চাকমা নামে পিসিপি-এর দুইজন সদস্যকে গাড়ীতে তোলে। এছাড়া স্বপন চাকমাকেও রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করা হয় এবং পপেন ত্রিপুরা, জামতলী, দীঘিনালাকে বেপরোয়া মারধরের ফলে সারা শরীর জখম হয়। সেনা ও পুলিশ সদস্যদের এ হামলায় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সাথোয়াই প্রু মারমা, জেলা শাখার সভাপতি প্রণতি বিকাশ চাকমা, জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ব্রজ কিশোর ত্রিপুরাসহ মোট ৩৩ নেতা-কর্মী ও সাধারণ পথচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে এলাকায় চরম ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

থানায় নেয়ার পর সুমন চাকমা কান্দ্রা ও প্রত্যয় চাকমাকে আরো মারধর করা হয়। সুমন চাকমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করার ফলে মাথা ফেটে যায় ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে জরুরী ভিত্তিতে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে নেয়া হয়। বেদম মারধরের ফলে প্রত্যয় চাকমার সারা শরীর জখম হয়। তারও মাথায় সেলাই দিতে হয়। তাদের দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। খাগড়াছড়ির এএসপি মাহবুবও স্বয়ং তাদেরকে বেত্রাঘাত করে।

থানায় নেয়ার পর উক্ত এএসপি মাহবুব থানা হাজতে রাখা নেতা-কর্মীদের নানা হুমকি ও ধমক দিয়ে বলেন যে, আপনারা কি করতে চান? আমাদের এক হাজার পুলিশ আছে। এক হাজার পুলিশের এক হাজার অস্ত্র আছে। আপনাদের কি আছে? আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। ইচ্ছা করলে আপনাদের সব কিছু শেষ করে দিতে পারি। আজকে সব বাঙালীরা এক হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন সময় আপনাদের শেষ করে দিতে প্রস্তুত আছে। সেনাবাহিনীর অবস্থা আজকে আপনারা দেখেছেন? ইচ্ছা করলে তারা সবকিছু করতে পারে। মহালছড়িতে শত শত ঘর পুড়ে দেয়া হয়েছে। শত শত বাঙালী বোট যোগে গিয়ে এসমস্ত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে সময় কি করতে পেরেছেন আপনারা? কোথায় গেলেন আপনাদের সেই নেতা। আসলে তাকে গ্রেপ্তার করবো। একজনকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে (রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও সুধাসিন্ধু খীসাকে ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছেন। কারণ এ সময় রক্তোৎপল ত্রিপুরা অফিসে ছিলেন না। অন্যদিকে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা শেষ করে জেলা প্রশাসনের আহুত রাতের আইন-শৃঙ্খলা সভায় জন্য সেই সময় তিনি সার্কিট হাউজে অপেক্ষা করছিলেন)। এতদিন বহু ধৈর্য্য ধরেছি। এখন আর ধৈর্য্য ধরা হবে না।

জনসংহতি সমিতির অফিসে হানা ও গ্রেপ্তারের কারণ হিসেবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে যে, পিকেটিংরত জেএসএস, পিসিপি ও যুব সমিতির সদস্যরা কয়েকটি মোটর সাইকেল ও একটি ট্রাক ভাংচুর করেছে। বস্তুতঃ পুলিশের এই বয়ানও বিকৃত ও অতিরঞ্জিত। অবরোধ চলাকালে দুপুরের দিকে খাগড়াছড়ি জিরো মাইল এলাকায় একটি ট্রাক দ্রুত বেগে খাগড়াছড়ি শহরের দিকে আসে। পিকেটাররা থামানোর চেষ্টা করলেও থামাতে পারেনি। পক্ষান্তরে ট্রাক ড্রাইভার পিকেটারদের চাপা দিতে চেষ্টা করে। পিকেটারদের বিচক্ষণতার কারণে তারা প্রাণে বেঁচে যায়। অপরদিকে যুবদলের নেতা মোহাম্মদ আবদুল সালাম পীং মরহুম বক্কর মিয়া, শব্দমিয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি এবং ছাত্রদলের নেতা মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বাবুল দ্রুত বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসার সময় খাগড়াছড়ি সদরের এম এন লারমা ভাস্কর্যের পাদদেশ সংলগ্ন এলাকায় পৌছলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এ সময় সেখানে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা পিকেটিং করছিল। দুর্ঘটনার পর মোহাম্মদ আবদুল সালাম এবং মোহাম্মদ সাইদুল বাবুল মোটর

সাইকেলটা সেখানে রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর কিছু উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী সেটেলার এসে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে। এসব ঘটনার পর পরই সেনা ও পুলিশ সদস্যরা এসে জনসংহতি সমিতির জেলা অফিস ঘেরাও করে এবং অফিসে অবস্থানরত সকল নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের মোটর সাইকেল পোড়ানোর প্রশ্নই উঠে না। কেননা চলমান এইচএসসি পরীক্ষার কারণে অটোরিক্স, মোটর সাইকেল ও রিক্সা প্রভৃতি যান অবরোধ কর্মসূচীর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য জনসংহতি সমিতি এযাবৎ দায়িত্বশীলতার সাথে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচী পালন করে আসছে।

খাগড়াছড়ি শহরে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক সাধারণ জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

২৭ মে ২০০৪ তারিখে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে ট্রাক ও মোটরসাইকেল ভাংচুর করার ভিত্তিহীন অভিযোগ করার পর এটাকে ইস্যু করে খাগড়াছড়ি শহরে চারদলীয় জোটের মদদে সেটেলার বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা ছড়িয়ে সেদিন খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরীকে হত্যার উদ্দেশ্যে পৌরসভা অফিস পর্যন্ত উক্ত সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করে। সেদিন মংক্যচিং চৌধুরী পৌরসভার অফিসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে না থাকলে সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করতো। অপরদিকে সেদিন সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি বাজারের ভাঙা ব্রিজ এলাকায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রক বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী বিমল জ্যোতি ত্রিপুরা মোটর সাইকেলযোগে আসার সময় তার উপর উল্লেখিত উচ্ছৃঙ্খল সেটেলার বাঙালীরা আক্রমণ করে। এতে করে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া সেদিন বিকাল বেলায় ছিল খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষ হতে প্রায় রাত হয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা স্ব স্ব বাড়ীতে চলে যাওয়ার সময় খাগড়াছড়ির সদর থানার সংলগ্ন এলাকায় ওঁৎপেতে থাকা সেটেলার বাঙালীরা পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের হামলা করে। এতে খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মঞ্জুলাল ত্রিপুরা ও জীবন ত্রিপুরাসহ কয়েকজন আঘাত প্রাপ্ত হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় রাজু মারমা পীং চাইহ্লা প্রু মারমা, গ্রাম চৌধুরী পাড়াকে সেটেলাররা মারধর করে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এসব ঘটনার সাথে জড়িত কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

খাগড়াছড়িতে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১১ জনকে সন্ধ্যায় মুক্তিদান

অবশেষে ২৭ মে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিস ও অফিস সংলগ্ন মহাজন পাড়া থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১১ জনকে মুচলেকা নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সাথোয়াই প্রু মারমা ও খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিভূ রঞ্জন চাকমা পীং যামিনী রঞ্জন চাকমা ছিলেন। অবশিষ্ট ৯ জন ছিলেন জনসংহতি সমিতির অফিস সংলগ্ন এলাকা ও মহাজন পাড়া থেকে এলোপাতারীভাবে গ্রেপ্তারকৃত সাধারণ ছাত্র-যুবক।

গভীর রাতে জেলা প্রশাসনের বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা সভা আহ্বান ও অবশিষ্টদের মুক্তিদানের আশ্বাস

২৭ মে তারিখে গ্রেপ্তারকৃত নেতা-কর্মী ও পথচারীদের মধ্য হতে ১১ জন নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেয়া হলেও অবশিষ্ট ২২ জন নেতা-কর্মীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। এতে করে পরিস্থিতি জটিলতর রূপ ধারণ করে। পরিস্থিতির এমনিতর অবস্থায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ২৭ মে রাতে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত আইন-শৃঙ্খলা সভায় চারদলীয় জোট, জোটের অঙ্গসংগঠনসমূহ, জোটের সমর্থনপুষ্ঠ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে ডাকা হয়। অপরদিকে কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রমুখ তিন জুম্ম নেতাকে ডাকা হয়। সভায় চারদলীয় জোট, জোটের অঙ্গসংগঠন ও জোটের সমর্থনপুষ্ঠ পেশাজীবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ একের পর এক রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করে। ফলে উক্ত আইন-শৃঙ্খলা সভা প্রকৃতপক্ষে চারদলীয় জোটের সভায় পরিণত হয়। তারা একতরফাভাবে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ আনে এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। অবশেষে উক্ত সভায় পুলিশ প্রশাসনসহ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস প্রদান করা হয় যে, গত ৩০ মে রোজ রবিবারের মধ্যে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি প্রদান করা হবে।

উল্লেখিত সভায় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে উপরোক্ত আশ্বাসের ভিত্তিতে ৩০ মে ২০০৪ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য জনসংহতি সমিতির চলমান সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী স্থগিত করা হয়। জনসংহতি সমিতি থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ৩০ মে ২০০৪ এর মধ্যে ২৫ মে সিন্ধুকছড়ি সেনা সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত পিসিপি, যুব সমিতি ও জনসংহতি সমিতির ১৭ জন কর্মী এবং ২৭ মে পুলিশ ও সেনা সদস্য কর্তৃক জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে হানা দিয়ে গ্রেপ্তারকৃত অপর ২২জন নেতা-কর্মীদের মুক্তি প্রদান করা না হলে ৩১ মে ২০০৪ থেকে কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

গুইমারায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৭ জনের মুক্তিলাভ

জেলা প্রশাসনের উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সিন্ধুকছড়ি সেনা সদস্য কর্তৃক গুইমারায় গ্রেপ্তারকৃত পিসিপি, যুব সমিতি ও জনসংহতি সমিতির ১৭ জনের মধ্যে ২৯ মে ২০০৪ তারিখে মংথোয়াই মারমা, উজাই মারমা, রূপায়ণ চাকমা, সাগর বাচ্চা চাকমা, মংচাই মারমা, দেবময় চাকমা ও অন্তর ত্রিপুরা প্রমুখ ৭ জন নেতা-কর্মীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়।

জেলা অফিস থেকে গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ২২ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের

গুইমারায় গ্রেপ্তারকৃত উল্লেখিত ৭ জন নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেয়া হলেও জনসংহতি সমিতির জেলা অফিস থেকে ২৭ মে গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ২২ জন নেতা-কর্মীসহ আরো ১১ জন ও অজ্ঞাতনামা ৩০/৩৫ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও গুলি বর্ষণ ইত্যাদির সাথে মিথ্যাভাবে জড়িত করে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১৪৩/ ১৪৪/ ৩৪২/ ৩২৩/ ৩২৪/ ৩২৬/ ৩৮৫/ ৪৩৬/ ৪২৭/ ৩৭৯/৩৪/ ৩৮৭ ধারাসহ বিস্ফোরক দ্রব্যদি আইনের ৩নং ধারা মোতাবেক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা (খাগড়াছড়ি থানার মামলা নং ২ তারিখ ২৭/০৫/২০০৪) দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত ১১ জনের মধ্যে ৩ জন জনসংহতি সমিতির স্থানীয় নেতা এবং ৭ জন আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনসমূহের কর্মী। ক্ষমতাসীন দলের এমপি উগ্র সাম্প্রদায়িক আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ষড়যন্ত্রে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠসমূহের স্থানীয় নেতাদেরও উক্ত মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। পরিস্থিতির এমনতর এক জটিল অবস্থায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবারো প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ২৫ মে সিন্ধুকছড়ি সেনা সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ১০ জন কর্মীকে তার পরদিন মুক্তি দেয়া হবে এবং ২৭ মে গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ২২জন নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা মুক্তিদানের সুবিধার্থে নমনীয় করা হবে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের পুনঃ আশ্বাস ও জনস্বার্থে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষিত সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করার ঘোষণা করা হয়। দায়েরকৃত মামলার অভিযুক্ত ২২ জন ও ১১ জনের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করা গেল ঃ

১। প্রণতি বিকাশ চাকমা পীং অজিত মোহন চাকমা, গ্রাম পানখিয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি (সভাপতি, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা)
২। ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা পীং অলেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি (ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা)
৩। রূপক চাকমা পীং যতিন বিকাশ চাকমা, গ্রাম মধুপুর, খাগড়াছড়ি (সহ সাধারণ সম্পাদক, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা)
৪। বীরেন্দ্র রাল চাকমা পীং ভোলানাথ চাকমা, গ্রাম মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি (সভাপতি, খাগড়াছড়ি থানা শাখা)
৫। প্রত্যয় চাকমা পীং মৃত রতন বিকাশ চাকমা, গ্রাম নারানখিয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি (সাধারণ সম্পাদক, পিসিপি খাগড়াছড়ি শাখা)
৬। নিউটন মারমা পীং কনসাই মারমা, গ্রাম আপার পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি (সাংগঠনিক সম্পাদক, পিসিপি জেলা শাখা)
৭। সুমন চাকমা (কাত্রা) পীং মন্টু চাকমা, গ্রাম নারানখিয়া, খাগড়াছড়ি সদর
৮। সুনিল কান্তি ত্রিপুরা পীং মৃত বরুন কান্তি ত্রিপুরা ওরফে বরেন্দ্র, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি
৯। কারপন ত্রিপুরা পীং মৃত পঞ্চরাম ত্রিপুরা, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি
১০। চাইছুইয়া ত্রিপুরা পীং মৃত ইয়ার্কীরায় ত্রিপুরা, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি
১১। ক্যাচিং মারমা পীং অচিং মারমা, গ্রাম মধুপুর, খাগড়াছড়ি সদর
১২। আলো জীবন চাকমা পীং পূণ্য রতন চাকমা, গ্রাম নারিকেল বাগান, দীঘিনালা
১৩। ছোট চাকমা পীং কালা চাকমা, গ্রাম বেতছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৪। জ্ঞান জ্যোতি চাকমা পীং বারী বিন্দু চাকমা, গ্রাম ধর্মজিৎ কার্বারী পাড়া
১৫। জ্ঞান জ্যোতি চাকমা পীং রঞ্জন কুমার চাকমা, গ্রাম জোড়া ব্রীজ, খাগড়াছড়ি
১৬। কার্তিক ত্রিপুরা (জমগিন) পীং মৃত নিছক ত্রিপুরা, গ্রাম পুনংপাড়া
১৭। আয়রন চাকমা পীং দয়াময় চাকমা, গ্রাম পুলিন হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা
১৮। সুরপন চাকমা পীং পদ্ম লোচন চাকমা, গ্রাম মাষ্টার পাড়া
১৯। বিমল জ্যোতি চাকমা পীং জ্ঞান কুমার চাকমা, গ্রাম পুলিন হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা
২০। মাইকেল চাকমা পীং বুদ্ধ রঞ্জন চাকমা, গ্রাম পুলিন হেডম্যান পাড়া, দীঘিনালা
২১। অনুমদর্শী চাকমা পীং পূর্ণ মোহন চাকমা, গ্রাম রিজার্ভছড়া
২২। স্বপন চাকমা পীং রমনী চাকমা, গ্রাম জোড়াব্রীজ, দীঘিনালা

মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্য ১১ জন ব্যক্তিবর্গ ঃ

১। সুধাকর ত্রিপুরা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর (সাংগঠনিক সম্পাদক, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা, জেএসএস)
২। বিপ্লব ত্রিপুরা পীং অজ্ঞাত, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর (সাধারণ সম্পাদক, খাগড়াছড়ি থানা শাখা, জনসংহতি সমিতি)
৩। উজ্জ্বল চাকমা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর (সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ)

৪। যতন ত্রিপুরা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী যুবলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক)
৫। রুকু মারমা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম পানখিয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর (ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য)
৬। কানু ত্রিপুরা পীং অজ্ঞাত (খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রলীগ নেতা)
৭। কৈলাশ ত্রিপুরা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম খাগড়াপুর, দীঘিনালা সদর (খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রলীগ নেতা)
৮। মংশিপ্রু চৌধুরী (অপু) পীং অজ্ঞাত, গ্রাম সুইচ গেইট, খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি)
৯। অপূর্ব ত্রিপুরা পীং যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্রাম মিলনপুর, খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি জেলা যুবলীগ নেতা)
১০। রিসোর্স চাকমা পীং অজ্ঞাত, গ্রাম কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক)
১১। মিলন চাকমা (মুখোশ বাবুল) পীং অজ্ঞাত, গ্রাম মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর এবং
খাগড়াছড়ি জেলার আরো অজ্ঞাতনামা ৩০/৩৫ জন।

অজ্ঞাতনামা ৪০/৪৫ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক আরেকটি মামলা দায়ের

খাগড়াছড়ি থানার এএসআই মোঃ আব্দুল আলীম কর্তৃক বেআইনীভাবে জনতা দলবদ্ধ হয়ে সরকারী কাজে সরকারী কর্মচারীকে বাধাদান ও জখম করার অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ৪০/৪৫ জনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৩/ ৩৩২/ ৩৫৩ ধারায় আরেকটি মামলা (খাগড়াছড়ি সদর থানার মামলা নং ০৩ তারিখ ২৮/০৫/০৪) দায়ের করা হয়। এজাহারে এএসআই মোঃ আব্দুল আলীম উল্লেখ করেন যে, ২৭ মে ২০০৪ বেতার মারফত খবর পেয়ে তিনি ও তার সঙ্গীয় ৮ জন পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে পৌছে দেখেন যে একটি মটর সাইকেল আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। উক্ত আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা করতে গেলে উক্ত ৪০/৪৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাদের উপর ইটপাটকেল ও বাটুল দ্বারা মারবেল পাথর নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়লে উক্ত ব্যক্তিরা পিসিপি অফিসের দিকে পালিয়ে যায়। উক্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের পুনরায় দেখলে তিনি ও তার সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা চিনতে পারবে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই মামলার মাধ্যমে পুলিশ জনসংহতি সমিতি, পিসিপি ও যুব সমিতির সদস্যসহ সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করবে।

গুইমারায় গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ১০ জন কর্মীর মুক্তিলাভ

পরবর্তীতে ২৫ মে সিন্ধুকছড়ি সেনা সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত অবশিষ্ট ১০ জন কর্মীকে ৩১ মে ২০০৪ তারিখে মুক্তি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী বরাবরই মিথ্যা প্রচারনা চালিয়ে এসেছিল যে, উল্লেখিত গ্রেপ্তারকৃত সদস্যরা সন্ত্রাসী। কিন্তু কোন তথ্য-প্রমাণ না থাকাই পরবর্তীতে তাদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়।

জজ কোর্ট থেকে দু' দফায় জামিন লাভ

জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হামলা চালিয়ে গ্রেপ্তারকৃত ২২ জনের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা আদালতে জামিন না মঞ্জুর হওয়ার পর ৬ জুন ২০০৪ চট্টগ্রাম জজ কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। সেদিনই প্রথম শুনানীতে প্রণতি বিকাশ চাকমা, ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা ও রূপক চাকমাসহ মোট ৯ জন নেতা-কর্মীর জামিন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই ২০০৪ অবশিষ্ট ১৩ জন নেতা-কর্মী চট্টগ্রাম জজ কোর্ট জামিণ লাভ করে।

উপসংহার

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গুইমারা এলাকায় মানবেন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্রের মুখে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সাধারণ মানুষের উপর অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা, শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ইউপিডিএফের অস্ত্রের মুখে এলাকাবাসী জিম্মি হয়ে পড়লে এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ এক পর্যায়ে ফেটে পড়ে। গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সদস্য গুইমারা এলাকার পাইন্দং পাড়া ও তাইন্দং পাড়া থেকে বৈদ্য রঞ্জন কার্বারী (৪৮), কদিয়ে চাকমা (২৬), শম্ভু চাকমা (৩৫), কলোই চাকমা (২৫) ও নিলু মোহন চাকমা (৬০) প্রমুখ ৫ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে এবং কয়েক লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবী করে।

এ ঘটনার পর এলাকার সাধারণ মানুষ ইউপিডিএফের উপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারপর দিন ২৩ এপ্রিল ২০০৪ তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ইউপিডিএফের ৫ জন সশস্ত্র সদস্যকে ধরে ফেলে। এমতাবস্থায় ২৫ এপ্রিল ২০০৪ ইউপিডিএফের সদস্যরা স্থানীয় জনগণের নিকট নিম্নোক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে মুচলেকা দিতে বাধ্য হয় ঃ

> **"১। অদ্য হইতে অত্র এলাকার জনগণের উপর ইউপিডিএফ এর সদস্য কর্তৃক নির্যাতন, অপহরণ ও মুক্তিপণ এবং হুমকি প্রদান করা হইবে না।**
>
> **২। অদ্য হইতে অত্র এলাকার কোন ব্যক্তি যদি ইউপিডিএফ সংগঠনের প্রতি ক্ষতিকর আচরণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কার্বারীর নিকট সোপর্দ করিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদন করিব। গণমান্য ব্যক্তি, কার্বারী/হেডম্যান যদি উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে ঐ**

ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করা হইবে। বিচার কার্য সম্পাদনের পূর্বে ঐ ব্যক্তিকে মানসিক/ শারীরিক নির্যাতন করা যাইবে না।

৩। অত্র এলাকার জনগণের প্রতি ইউপিডিএফ এর সদস্য কর্তৃক অহেতুক হয়রানি করা হইবে না।

উল্লিখিত শর্তাবলী যদি কখনো ভঙ্গ করা হয় তাহা হইলে অত্র এলাকার জনগণ কর্তৃক যে কোন প্রতিক্রিয়া মানিয়া লইব এবং এর দায়ভার সংগঠনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।"

ইউপিডিএফের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করেন ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রদীপন খীসা এবং পিসিপি'র খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি স্বপন চাকমা। অপরদিকে এলাকার জনসাধারণের পক্ষে মিখন, অনিল কার্বারী ও অনিল বিকাশ চাকমাসহ ৬ জন ব্যক্তি। কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে অপপ্রচার করা হয় যে, জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ইউপিডিএফের উক্ত ৫ জন সদস্যকে অপহরণ করা হয়।

অপরদিকে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ, সমর্থক ও শুভানুধায়ীদের সার্বিক সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীরা গুইমারা এলাকায় সাংগঠনিক সফর শুরু করে। জনসংহতি সমিতির উক্ত সাংগঠনিক তৎপরতা স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেনি। ফলে এক পর্যায়ে গত ১৫ মে ২০০৪ গুইমারা ব্রিগেডের ছত্রছায়ায় মানবেন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের কর্মীদের উপর গুইমারা বাজার এলাকায় এক হামলা চালায়। ইউপিডিএফ সদস্যরা লোহার রড, হকিষ্টিক ও দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা করে। ঘটনার সময় সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরোক্ষভাবে ইউপিডিএফ সদস্যদের মদদ যোগায়। অবশেষে গুইমারা থানার পুলিশ গিয়ে জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের কর্মীদের উদ্ধার করে। উক্ত হামলায় শিপলু ত্রিপুরা (১৯) পীং উত্তম ত্রিপুরা এবং যোসেফ চাকমা (২২) পীং চন্দ্রশেখর চাকমা নামে পিসিপি'র দুই কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করা এবং পক্ষান্তরে ইউপিডিএফের সশস্ত্র শক্তিকে সহায়তার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। গুইমারা থানার এএসআই মোঃ আতাউর রহমান কর্তৃক আদালতে দায়েরকৃত এজাহারে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে উল্লেখ করা হয় যে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা **"বিভিন্ন সময় ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে অপহরণ করিয়া গুইমারা ও বাজার এলাকায় চরম অশান্তি ও অপরাধজনক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে"**। এজাহারের এই মিথ্যা ও বানোয়াট বয়ান সেনাবাহিনী ও পুলিশের সেই হীনউদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

বস্তুতঃ রাজনৈতিকভাবে জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বানচাল করা ও ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে চলমান জনরোষ রোধ করে ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র শক্তিকে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় সেনাবাহিনী জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের গুইমারায় গ্রেপ্তার-নির্যাতন অভিযান চালায় এবং খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া গ্রামে হামলা, খাগড়াছড়ি জেলা শহরে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানিদান ও হামলা, জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা সদর কার্যালয়ে হামলা পরিচালনা, নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও অজামিনযোগ্য সাজানো মামলা দায়ের ইত্যাদি কার্যক্রম এই বৃহত্তর পরিকল্পনার একাংশ মাত্র। এসবের কারণেই খাগড়াছড়ি সদরে পরিস্থিতির অবনতি হয় যার জন্য পার্বত্য চট্টগাম জনসংহতি সমিতি দায়ী নয়। দায়ী সেনাবাহিনীরই একাংশ যা ঘটানো হয়েছে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর আওতায়।

নিরীহ ছাত্র জিম্পু চাকমাকে মাটিরাঙ্গা জোনে পিটিয়ে হত্যা

২৩ আগষ্ট ২০০৪ মাটিরাঙ্গা জোনের ২৭ ইবিআরের সেনা সদস্যরা এই নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। সেদিন সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাংগা জোনের সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং মাটিরাংগা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অমরসিং চাকমার ছেলে জিম্পু চাকমাকে (১৮) মাটিরাঙ্গা বাজার থেকে গ্রেফতার করে মাটিরাংগা জোন অফিসে নিয়ে যায়। জোনের সেনা জওয়ানরা ক্যাম্পে আঘাতের পর আঘাত করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন ২৩ আগষ্ট মাটিরাঙ্গা সদরস্থ চর পাড়ার নিজ বাড়ী থেকে মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ১০নং আলুটিলার বেঙমারা এলাকার বাগানবাড়ীতে যাওয়ার সময় সেনা সদস্যরা মাটিরাঙ্গা বাজার থেকে কোন অপরাধ ছাড়াই তাকে ধরে নিয়ে যায়। এই নৃসংশ হত্যাকান্ডকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য এক বন্দুক যুদ্ধের নাটক করতে মাটিরাঙ্গা জোন কমান্ডারের নির্দেশে সেনা সদস্যরা ২৪ আগষ্ট মৃত জিম্পু চাকমাকে একটা চাঁদের গাড়ীতে করে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের ৯ মাইল এলাকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর পোষ্ট মর্টেমের জন্য খাগড়াছড়ি সদর থানার পুলিশের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক অপপ্রচার চালানো হয় যে, সন্দেহজনকভাবে মাটিরাঙ্গা বাজারে ঘোরাফেরার সময় সেনাবাহিনী জিংফু চাকমা নামে একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে এবং তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের নয় মাইল এলাকায় সন্ত্রাসীদের আস্তানা ঘেরাও করতে গেলে সেনাবাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলি বিনিময়কালে ক্রসফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে জিংফু চাকমা মারা যায়। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যথাযথভাবে যাচাই না করে সেদিন ২৪ আগষ্ট সন্ধ্যা ও রাতের খবরে এটিএন বাংলা ও এনটিভি'তে এবং তার পরদিন ২৫ আগষ্ট কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের উক্ত ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বয়ান হুবহু প্রচার করা হয়।

জিম্পু চাকমার বাড়ী মাটিরাঙ্গা থানা সদর ও পৌরসভা এলাকার চর পাড়ায় মাটিরাঙ্গা বাজারের এক কিলোমিটার পশ্চিমে। আর বাগান বাড়ীর অবস্থান হলো মাটিরাঙ্গা বাজার হতে ২/৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি সড়কের ১০ নম্বর নামক স্থানের সন্নিকটে। জিম্পু চাকমার পিতা অমরসিং চাকমা পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য। সময়ান্তরে বাগানবাড়ীতে থাকতেন। বাগান-বাগিচা দেখভাল করতেন। জানা যায়, ঐদিন ২৩ আগষ্ট সকালে খাওয়া-দাওয়ার পর জিম্পু চাকমা তার মায়ের অনুরোধে বাবাকে কাজের সাহায্যের জন্য বাগানবাড়ীতে যাচ্ছিল। পরনে ছিল ফুলপ্যান্ট ও শার্ট। আর সঙ্গে ছিল কিছু চাল, পাকা কলা ও কাঁচা তরকারী সমেত একটা থলে (প্লাস্টিক বস্তার তৈরী)। মাটিরাঙ্গা বাজার গিয়ে শিল্পী ষ্টোর নামক এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিল জিম্পু। তখনই গুইমারা ব্রিগেড আওতাধীন মাটিরাঙ্গা সেনা জোন ২৭ ইবিআর এর একটা সেনা টহল দল এসে জিম্পুকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়। সেনা টহল দল কর্তৃক ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবার খবর পেয়ে তার মা বাগানে লোক পাঠালেন স্বামীকে খবর দিতে এবং নিজে ছুটে গেলেন মাটিরাঙ্গা সেনা জোন সদরে। সংগে নিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সভাপতি উদয় কিরণ ত্রিপুরা ওরফে অজিত ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সদস্য হেমেন্দ্র লাল ত্রিপ্ররাকে। দুপুর সাড়ে ১২টায় জোন সদরের আরপি পোষ্টে পৌছে যোগাযোগ করা হলো। প্রায় আধাঘন্টা পর হোসেন নামে জনৈক আরপি সার্জেন্ট এসে কথা বললেন এবং স্বীকার করলেন তাদের সেনা টহলদল জিম্পু চাকমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি এও জানালেন, চিন্তা করার নেই। ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

সে সময় সার্জেন্ট হোসেনের ব্যবহৃত ওয়্যারলেস (কডলেস) সেটে কথা বলাবলি করতে শোনা গিয়েছিল যে, (সম্ভবত ক্যাম্প থেকে কোথাও রিপোর্ট করা হচ্ছিল) যে ছেলেটাকে ধরা হয়েছে সে সবকিছু স্বীকার করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে সার্জেন্ট হোসেন তার ওয়্যারলেস সেট বন্ধ করেন এবং আরপি পোষ্ট হতে ক্যাম্পে চলে যান। প্রায় ঘন্টা খানেক পর তিনি পুনরায় আরপি পোষ্টে এসে জানান, জোনের কম্যান্ডিং অফিসার গুইমারা ব্রিগেডে গিয়েছিলেন। সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডার মেজর ফেরদৌস নাকি বলেছিলেন, সিও সাহেব না ফেরা পর্যন্ত ছেলেটাকে ছেড়ে দেয়া যাচ্ছে না। ওদিকে বাগান বাড়ীতে খবরটা পৌছলে জিম্পু চাকমার পিতা অমর সিং চাকমা বাড়ীতে ছুটে আসেন। বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নিয়ে আবারও মাটিরাঙ্গা জোন সদরে যান। রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত আরপি পোষ্টে তারা অপেক্ষা করলেন। জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল এনায়েত উল্লাহ পিএসপি সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জোন সদরে ফিরেছিলেন ঠিকই। কিন্তু দেখা করলেন না অমর সিংদের সাথে এবং কোন অফিসারকে দেখা করতে দিলেন না। একজন সিপাহী মারফত তাদেরকে বলা হয় বাড়ীতে চলে যাবার জন্য।

তারা বাড়ীতে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন মাটিরাঙ্গা থানায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেক তখন থানায় ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার এসআই সেলিম ও এএসআই অশোক-এর সাথে তিনি কথা বললেন। এরপর উদয় কিরণ ত্রিপুরা মাটিরাঙ্গার বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে

থানায় ওসি খালেক এবং বিএনপির স্থানীয় কিছু নেতার সাথে আলাপ করেন। জিম্পু চাকমার মুক্তির বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। তখন ওসি জানান, থানায় সোপর্দ করা হলে সাধ্যমত সহযোগিতা দেয়া হবে।

পরদিন ২৪ আগষ্ট সকালে অমর সিং চাকমা মাটিরাঙ্গা পৌরসভা চেয়ারম্যান নাসির আহমেদ চৌধুরীর কাছে যান। একমাত্র পুত্র জিম্পু চাকমার মুক্তির বিষয়ে সহযোগিতা চান। তখন পৌর চেয়ারম্যান টেলিফোনে মাটিরাঙ্গা জোন সদরে যোগাযোগ করেন। ১০ মিনিট পর যোগাযোগ করতে বলা হয় জোন সদর হতে। তদনুযায়ী যোগাযোগ করা হলে জোন সদর হতে জানানো হয় যে, জিম্পু চাকমাকে খাগড়াছড়ি জোনে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই যাতে তার আত্মীয়রা যোগাযোগ করে। তৎপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি অবস্থানরত জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য রক্তোৎপল ত্রিপুরা প্রথমে খাগড়াছড়ির ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড সদরে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। কোন লাইন পাননি। এর পরপরই খাগড়াছড়ি সেনা জোন সদরে যোগাযোগ করেন। উত্তরে জানানো হয়, তাদের সেখানে সেরকম কোন বন্দী আনা হয়নি।

ঐদিন (২৪ আগষ্ট) দুপুরে উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নিয়ে অমরসিং চাকমা গুইমারা গিয়ে কংজরী চৌধুরীর মাধ্যমে গুইমারা ব্রিগেড সদরে যোগাযোগ করা চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে হয় তাদের। ঐদিনই রাত সাড়ে ৮টায় মাটিরাঙ্গা থানার এএসআই ফখরুল স্কুটার যোগে অমরসিং চাকমার বাড়ীতে যান এবং জানান যে, মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশের সহযোগিতায় জিম্পু চাকমা বিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় যেতে হবে। উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরা মাটিরাঙ্গা থানায় গিয়ে জানতে পারেন, জিম্পু চাকমার মৃতদেহ ময়না তদন্ত শেষে খাগড়াছড়ি সদর থানায় রাখা হয়েছে। তাদের লাশ বুঝে নিতে হবে। মাটিরাঙ্গা থানার এএসআই অশোকের নেতৃত্বে ৪/৫ জন পুলিশ এবং উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি সদর থানায় পৌছেন রাত ১০টায়। জিম্পু চাকমার লাশ বুঝে নেয়া বিষয়ে উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাথে খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ-এর মধ্যে কিছুক্ষণ বাকবিতন্ডা হয়। ঐ অবস্থায় লাশ বুঝে নিলেন না উদয় কিরণ ত্রিপুরা ও হেমেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ সদর থানা থেকে চলে যান আত্মীয় বাড়ীতে।

সেদিন (২৪ আগষ্ট) রাত সাড়ে ১১টায় পুলিশ জিম্পু চাকমার লাশ নিয়ে পৌছলো মাটিরাঙ্গায়। অমরসিং চাকমার বাড়ীতে নিয়ে যায় রাত ১২টায়। তারও আগে অমরসিং চাকমার বাড়ীতে পৌছেন মুনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পৌরসভা চেয়ারম্যান নাসির আহমেদ চৌধুরী, কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম, শামসুল হক, বাদশা মিয়া ও মাটিরাঙ্গা থানা ওসি খালেক। তারা বিষয়টা দুর্ঘটনাক্রমে হয়েছে বলেন এবং ছেলের লাশ বুঝে নিতে অমরসিংকে অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে ওসি এও বলেন যে, লাশ যে কোনভাবে অভিভাবকের কাছে হস্তান্ত র করা বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে তার উপর তীব্র চাপ রয়েছে। আবার অন্যদিকে হুমকি প্রদান করেন এই বলে যে, অভিভাবক হিসেবে লাশ বুঝে না নিলে বেওয়ারিশ হিসেবে পৌরসভার মাধ্যমে লাশ দাহ/দাফন করা হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অমরমসিং চাকমা তার পুত্রের লাশ বুঝে নিতে রাজী হলেন দুটো শর্তে। প্রথমতঃ লাশ ময়না তদন্ত রিপোর্ট দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ লাশ হস্তান্তর দলিলে 'অনুপম চাকমা ওরফে' বাদ দিয়ে কেবল জিম্পু চাকমা উল্লেখ করতে হবে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে দেয়া হবে এবং 'অনুপম চাকমা ওরফে' শব্দগুলো বাদ দিয়ে নতুন করে লাশ হস্তান্তর দলিল লেখার পরই অমরসিং চকমা তার ছেলের লাশ বুঝে নেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জিম্পু চাকমার দ্বিতীয় কোন নাম নেই। জিম্পু হচ্ছে তার একমাত্র নাম। কিন্তু সেনা-পুলিশ সদস্যরা একজন নিরীহ লোককে হত্যা করে নিজেদের অপকর্ম জায়েজ করার হীন উদ্দেশ্যে টিভি, রেডিও ও পত্র-পত্রিকায় প্রচার চালায় 'অনুপম চাকমা ওরফে জিম্পু চাকমা' নামে। জানা যায় যে, অনুপম চাকমা নামে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাটিরাঙ্গা ও গুইমারা থানায় হত্যা, অপহরণ ও চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

ময়না তদন্তকালে জিম্পু চাকমার শরীর সম্পূর্ণ ছেঁড়া-কাটা হয়। জিম্পু চাকমার লাশ পাওয়ার পর দেখা যায়, মুখমন্ডলের ডান পার্শ্ব (গাল) ও হাত-পা অস্বাভাবিক ফোলা এবং সর্বাঙ্গে কালো দাগ রয়েছে। ধারণা করা হয়, সেনা সদস্যরা গ্রেপ্তারের পর ক্যাম্পে অমানুষিকভাবে শারিরীক নির্যাতনের ফলে ২৩ আগষ্টের বিকালেই জিম্পু চাকমাকে হত্যা করে। আর তা জায়েজ করার জন্য ২৪ আগষ্ট 'অনুপম চাকমা ওরফে জিম্পু চাকমা' নামীয় এক সন্ত্রাসী নিহত নাটক সাজায় এবং অপপ্রচারনা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মাটিরাঙ্গা সেনা জোন হতে সেনা সদস্যদের দু'টো পিক-আপ ভ্যান ঐ দিন (২৪ আগষ্ট) সকালে আলুটিলায় যায়। সম্ভবতঃ ঐ ভ্যানে জিম্পু চাকমার লাশ আনা হয়। এরপর একইদিন দুপুরে (আনুমানিক ১২টায়) মাটিরাঙ্গা ও গুইমারা এলাকায় ব্যবহার করে এমন একটা জীপ (চাঁদের গাড়ী) লাল ফ্ল্যাগ টাঙানো অবস্থায় (সচরাচর লাশ বহনকারী জীপে লাল ফ্ল্যাগ টাঙানো হয়) পুলিশসহ আসতে দেখা যায়। এটা অনেকে জিরো মাইল, বাস টার্মিনাল ও চেঙ্গি স্কোয়ার এলাকায় প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐদিন বেলা ১টার দিকে কৃষি গবেষণা ও বেলা দেড়টা নাগাদ খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের সাত মাইল এলাকায় পুলিশসহ উক্ত গাড়ীটি এবং তার পিছনে সেনা সদস্যসহ ৪/৫টি সেনা পিক-আপ ভ্যান গাড়ী দেখা যায়। এরপর সেনা-পুলিশবাহী গাড়ীগুলো খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের ৮ ও ৯ মাইলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থামে এবং ঐ এলাকার জুম চাষীদের তাড়িয়ে দেয়। প্রায় পৌণে এক ঘন্টা অবস্থানের পর সেনা-পুলিশ দল পুনরায় খাগড়াছড়ির দিকে ফিরে আসে। পুলিশসহ ঐ জীপ গাড়ী যোগে জিম্পু চাকমার লাশ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে বিকাল ৩টায় এবং ময়না তদন্ত কাজ করা হয় সন্ধ্যা ৬টার দিকে।

ময়না তদন্ত চলে পুলিশ প্রহরায় এবং এরপর লাশ নিয়ে রাখা হয় খাগড়াছড়ি সদর থানায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ঐদিন (২৪ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আরএমওকে জানিয়ে দেয়ার জন্য জনৈক বাঙালী কর্তৃক ফোনে হাসপাতালে জানানো হয় যে, একটা লাশ আসবে। তা যেন সেদিনই পোস্ট মর্টেম করা হয়। জানা যায়, ঐ দিন জিম্পু চাকমার লাশ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন লাশ হাসপাতালে আনা হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, জিম্পু চাকমার হত্যাকান্ড নিয়ে নাটক করলেও সেনা-পুলিশ ও প্রশাসন ভয়ে ছিল সদা সন্ত্রস্ত। গণরোষের ভয় ছিল তাদের সবচেয়ে বেশী। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে এই ইস্যুকে নিয়ে গণ আন্দোলন হতে পারে এমন ভয় তাদের ছিল। তাছাড়া জিম্পু চাকমার হত্যাকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বিভিন্ন সাংবাদিক, মানবাধিকার সংস্থা, ইউএনডিপি ও এনজিও কর্মী মাটিরাঙ্গা যাবেন এমন আশঙ্কায় ছিল সেনা পুলিশসহ সরকারী বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে সেনা-পুলিশ ও প্রশাসন। তাই ২৩ আগষ্ট হতে মাটিরাঙ্গা ও খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় জনসংহতি সমিতির অফিসে ও নেতাকর্মীদের উপর সেনা-পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের কড়া নজরদারী ছিল। ২৪ আগষ্ট জিম্পু চাকমার লাশ হস্তান্তরের পর ২৫ আগষ্ট হতে নজরদারী আরও জোরদার হয় এবং মাটিরাঙ্গা ও খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় সেনা-পুলিশ টহলসহ নেয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর সেজন্য ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলা সদর হতে জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ও যুব সমিতির একদল নেতা-কর্মীদেরকে জিম্পু চাকমার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে বাধা দেয়া হয়। ঐদিন বেলা দেড়টার দিকে জড়িতা চাকমা ও চৈতালী ত্রিপুরার নেতৃত্বে একটা পিক-আপ যোগে তারা জিম্পু চাকমার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে খাগড়াছড়ি থেকে মাটিরাঙ্গা যাচ্ছিলেন। প্রথমে তাদেরকে সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি জোনের সিও'র নেতৃত্বে দু'টো জীপ যোগে একদল সেনা খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনাল এলাকায় এবং তৎপরে চেঙ্গীব্রীজ চেক পোষ্টে গাড়ী থামিয়ে চেক করে মাটিরাঙ্গায় যেতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। এরপর নেতা-কর্মীরা মাটিরাঙ্গা বাজার এলাকায় চর পাড়ার রাস্তার মুখে পৌছলে সেনা-পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা গাড়ী আটকায় এবং চর পাড়ায় জিম্পু চাকমাদের বাড়ী যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। একপর্যায়ে নানা হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক খাগড়াছড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

এরপর ২৮ আগষ্ট জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি প্রণতি বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একদল নেতা-কর্মী মাটিরাঙ্গার চর পাড়ায় অমরসিং চাকমার বাড়ীতে যান। এ খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মাটিরাঙ্গা থানার এএসআই অশোক-এর নেতৃত্বে একদল পুলিশও সেখানে যান এবং দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য প্রণতি বিকাশ চাকমাদের নির্দেশ দেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা কর্তব্য পালন করছে বলেও পুলিশ সদস্যরা জানায়।

উল্লেখ্য যে, জিম্পু চাকমা হত্যা বিষয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় কোন মামলা হয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যেছে যে, ২৪ আগষ্ট খাগড়াছড়ি সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু মামলার ধরন কি তা থানা কর্তৃপক্ষ থেকে জানা সম্ভব হয়নি।

মা-বাবার চার সন্তানের মধ্যে জিম্পু চাকমা দ্বিতীয় এবং একমাত্র পুত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকে একটু সহজ-সরল প্রকৃতির ছিল সে। ২০০২ সালে মাটিরাঙ্গা হাই স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে 'বি' গ্রেডে মাধ্যমিক পাশ করে। এরপর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয় ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে। নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে বাড়ী চলে আসে ১৭ মে ২০০৪ এবং ১৪ আগষ্ট ২০০৪ চট্টগ্রামে যায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী কৃষি ডিপ্লোমা কলেজে ভর্তির জন্য। ভর্তি ফরম জমা দিয়ে ২০ আগষ্ট সে মাটিরাঙ্গায় চলে আসে। ৫ সেপ্টেম্বর তার উক্ত কৃষি ডিপ্লোমা কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেনা দুর্বৃত্তদের হাতে মর্মান্তিকভাবে অকালে প্রাণ হারানোর ফলে কলেজে আর ভর্তি হতে হলো না তার।

এই নৃশংস ও অমানবিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকে খাগড়াছড়ি জেলায় ২৯ আগষ্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় এবং ৩০ আগষ্ট রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন করা হয়। তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে জিংফু চাকমাকে নৃসংশভাবে হত্যা এবং জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক দোষী সেনা জওয়ানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়।

চিৎমরম এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক মংমং মারমাকে হত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলা

২৯ জুলাই ২০০৪ আনুমানিক অপরাহ্ন ১.৩০ ঘটিকায় কাপ্তাই ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন আইল্যান্ড ক্যাম্পের একদল সেনা গুলি করে চিৎমরম এলাকার অধিবাসী মংমং মারমা ওরফে উজ্জ্বল দাশকে হত্যা করেছে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থ স্থান চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে জুতাপায়ে প্রবেশ করে বিহারের পবিত্রতা নষ্ট এবং ভিক্ষু ও এতিম বালকদের লাঞ্ছিত করে। এছাড়া চিৎমরম বড় পাড়ার উপর হামলার জন্য সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দেয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঐদিন দুপুর বেলায় আইল্যান্ড ক্যাম্পের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে আইল্যান্ড ক্যাম্পের একদল সেনা কাপ্তাই সদর থেকে শতাধিক সেটেলার বাঙালী নিয়ে তথাকথিত সন্ত্রাসী খোঁজার নামে চিৎমরম এলাকায় এই হামলা চালায়। সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালীরা জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীদের নির্বিচারে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ী গুলি চালায়। এতে মুসলিম পাড়া সংলগ্ন পুকুর পাড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মংমং মারমা ওরফে উজ্জ্বল দাশ ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এরপর সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা চিৎমরম বড় পাড়ায় হামলা চালায়। এ সময় চিৎমরম ইউপি সদস্য শ্রী উমং মারমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং বাড়ীর মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট ও তছনছ করে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থ স্থান চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালায়। বৌদ্ধ মন্দিরটি ঘেরাও করে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী খোঁজার নামে বৌদ্ধ বিহারে জুতাপায়ে ঢুকে পড়ে। এ সময় বিহারের ভিক্ষু চাইন্দা ওয়াইসা প্রতিবাদ করলে সেনা সদস্যরা তাকে লাঞ্ছিত করে এবং আপ্রুশে মারমা ও পাইউখই মারমা নামে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর দুই এতিম ছাত্রকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে। এ সময় চিৎমরম ইউপি চেয়ারম্যান থোয়াইচিং মারমাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে সেনাবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন হুমকি দেয়।

চিৎমরম ইউপি চেয়ারম্যান থোয়াইচিং মারমার সাথে কথা বলে জানা যায় যে, ২৯ জুলাই ২০০৪ ঘটনার খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করলে মেজর জাকির হোসেন তাকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেয়। তিনি আরো জানান যে, ঘটনার দু'দিন আগে ২৭ জুলাই অবৈধভাবে গাছ কাটার অভিযোগে চিৎমরম খালমুখ ফরেষ্ট বিট কর্তৃপক্ষ তিনজন সেটেলার বাঙালীকে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা থেকে আগত সেটেলার বাঙালীরা সেদিন বিট অফিস ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে ২৯ জুলাই সেনাবাহিনীর একদল সদস্য ঘটনাস্থলে আসে। সেটেলার বাঙালীরা সেনা সদস্যদের নিকট তাদের অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে বিট অফিস ভাঙার জন্য স্থানীয় পাহাড়ী-বাঙালীদের দায়ী করে। একপর্যায়ে সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীরা যৌথভাবে স্থানীয় লোকজনদের উপর চড়াও হয়। দা, কুড়াল, বল্লম ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র সজ্জিত সেটেলার বাঙালীদের হামলার অগ্রভাবে রেখে সেনা সদস্যরা স্থানীয় লোকজনদের ধাওয়া করতে থাকে। এ সময় মসজিদের পাড় নামক এলাকায় পৌছলে সেনা সদস্যরা স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে এবং মংমং মারমা ওরফে উজ্জ্বল দাশ গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও মংমং মারমা ওরফে উজ্জ্বল দাশ বাঁচতো বলে তিনি দাবী করেন। গুলিবিদ্ধ মংমং-এর উপর সেটেলাররা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান যে, মংমং'কে হত্যা করার পর সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীরা জুম্ম অধ্যুষিত চিৎমরম বড় পাড়া নামক গ্রাম আক্রমণ করতে আসলে পথে চিৎমরম ইউপি সদস্যা আয়েশা বেগম তাদেরকে গতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটেলাররা তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর সেটেলারা সেনা সদস্যদের সহায়তায় বড় পাড়ার তিনটি বাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং বৌদ্ধ ধর্মালম্বলীদের তীর্থস্থান চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে ধর্মীয় পরিহানি সংঘটিত করে। তিনি আরো জানান যে, ঘটনা ঘটেছে চিৎমরম গ্রাম থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। ঘটনাস্থল ও চিৎমরম গ্রামের মাঝখানে ছিল আরো একটি বাঙালী গ্রাম। কিন্তু কোথাও কোন হামলা না করে সরাসরি চিৎমরম বড় পাড়ায় হামলা চালানো হয় বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি আরো জানান, নিহত মংমং-এর স্ত্রী চন্দ্রঘোনা থানায় মামলা করতে গেলে থানা পুলিশ মামলা নেয়নি।

চিৎমরম ইউপি মেম্বার উমং মারমার হামলার অন্যতম শিকার। তাঁর সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তার বাড়ীতে হামলার খবর শুনে আনুমানিক সকাল ১১.০০ ঘটিকায় তিনি দোকান থেকে বাড়ীতে আসেন। এসে দেখেন সেনা সদস্যরা বাড়ীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে। আর সেটেলার বাঙালীরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে বাড়ীর মূল্যবান জিনিসপত্র ভাংচুর লুটপাট করছিল। সেটেলাররা শো কেস, আলমারী, ঘড়ি, ফ্যান, খাট, ড্রেসিং টেবিল, ফুলের টব ইত্যাদি জিনিসপত্র ভাংচুর করে। এছাড়া আলমারী থেকে ২ ভরি সোনা ও ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে তিনি জানান। তিনি এর প্রতিবাদ করলে সেনা সদস্যরা তাকে গ্রেপ্তারের হুকমি দেয়।

চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের অষ্টম শ্রেণীর অনাথ ছাত্র আথুচে মারমা জানান যে, সেদিন তারা (ছাত্ররা) ফুটবল খেলার পর বিহারে স্ব স্ব পড়ার ঘরে আসে। সে সময় সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা বিহারটি ঘেরাও করে। এরপর সেনা সদস্যরা বন্দুক তাক করে ভেতরে যারা আছে তাদেরকে বাইরে আসতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় গুলি করবে বলে হুমকি দেয়। সে এবং তার একসঙ্গী বিহার থেকে বাইরে আসার সাথে সাথে সেনা সদস্যরা তাদেরকে ধরে ফেলে এবং দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে রাখে। এসময় এক সেনা সদস্য তাকে মুখে এক ঘুষি মারে বলে জানায়। বিহারের ভিক্ষু চাইন্দা ওয়াইসা ভান্তে এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে সেনা সদস্যরা তাকে গালিগালাজ করে বলে আথুচে জানায়। এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা সেটেলারদের নিয়ে জুতা পায়ে বিহারের ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাসী চালায়। ইহা জানা গেছে যে, কিছু দিন আগে কাপ্তাই এলাকায় কাঠ পাচারকারী এবং স্থানীয় বন বিভাগের কর্তৃপক্ষের মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বন বিভাগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীদের মাধ্যমে এই হামলা চালানো হয় বলে স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেছে।

বিডিআর কর্তৃক বরকল উপজেলার ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র ও বৌদ্ধ মন্দির ক্ষতি সাধন ও উচ্ছেদ

গত ২৭ মে ২০০৩ ৩৪ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়নের বরকল বিডিআর জোনের অধিনায়ক মেজর মোঃ রশীদ ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র ও বৌদ্ধ মন্দির উচ্ছেদ ও ক্ষতি সাধন করেন। নানিয়ারচর ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুর সাথে কথা বলার অজুহাত দেখিয়ে তিনি সেদিন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের প্রথমে বরকল বিডিআর জোন হেডকোয়ার্টারে এবং পরে ফালিটাঙ্যাচুগে নিয়ে যান। ফালিটাঙ্যাচুগে নিয়ে ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দির ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত গণ্যমান্য ও জনপ্রতিনিধিদের বৌদ্ধ মন্দিরের সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু স্থানীয় গণ্যমান্য ও জনপ্রতিনিধিরা সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলার অস্বীকৃতি জানালে বিডিআরের অধিনায়ক মেজর রশীদ নিজে উক্ত সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলেন এবং এরপর জনপ্রতিনিধিদেরকে উক্ত ভাঙ্গা সাইনবোর্ড ধরে দাড়াঁতে বাধ্য করে ও ফটো তোলে। তারপর মেজর রশীদ মন্দিরের বৌদ্ধ পতাকা নামানোর জন্যও জনপ্রতিনিধিদের বাধ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা তাতেও আপত্তি জানালে পরে বরকল উপজেলার ইউএনও উক্ত বৌদ্ধ পতাকা নামান। এ সময় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বৌদ্ধ পতাকার স্তম্ভ-এর পাশে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়। এ সময়ও মেজর রশীদ জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছবি তোলে। এভাবে জোরজবরদস্তি করে ধর্মীয় পরিহানিকর কাজ করার পর বিডিআর অধিনায়ক মেজর রশীদ উপস্থিত স্থানীয় লোকজনের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে। কিন্তু উক্ত মিষ্টি উপস্থিত কেউই গ্রহণ করেনি।

উক্ত ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধর্মীয় পতাকা ও সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলার পর পরবর্তীতে তৎস্থলে তথাকথিত **"শহীদ সাত্তার টিলা"** নামকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি হাবিলদার ফজলুরের নেতৃত্বে উক্ত জোনের একদল বিডিআর সদস্য বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকে। শুধু তাই নয় বিডিআর সদস্যরা উক্ত ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত আবাসিক গৃহ ও দেশনালয় ভেঙ্গে ফেলে। একই সাথে পূজারত নর-নারীদের বৌদ্ধ মন্দিরে সমাগমনের নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্থানীয় অধিবাসী স্নেহময় চাক্মা ও কিষ্ট মোহন চাকমা পূজা দিতে গেলে বিডিআর সদস্যরা বৌদ্ধ মন্দিরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে এবং মন্দিরে পূজারত মহিলাদেরকে টেনে হেঁচড়ে মন্দির থেকে বের করে দেয়। শুধু তাই নয়, বিডিআর সদস্যরা সদর্পে জুতাপায়ে প্রবেশ করে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এবং ধর্মীয় অবমাননা করে।

বিগত ৩১ মে ২০০৩ স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বিডিআর জোনের অধিনায়ক মেজর মোঃ রশীদ উক্ত ভাবনা কুঠির ও মন্দিরের দেশনালয় ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে ফালিটাঙ্যাচুগে পুনরায় রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিলে এলাকার অধিবাসীগণ বরকল উপজেলা সদরে বিডিআর-এর এহেন ধর্মীয় পরিহানিমূলক অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে তথা ভাবনা কুঠির ও মন্দির রক্ষার্থে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ২৭ মে ২০০৩ স্থাপিত অস্থায়ী বিডিআর ক্যাম্পটি প্রত্যাহার ও মন্দির উচ্ছেদের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়নি।

মেজর মোঃ রশীদ বরকল জোন হতে বদলী হলে তৎস্থলে নতুন জোন কমান্ডার হিসাবে লেঃ কর্নেল মোঃ রেজা বদলী হয়ে আসেন। তিনিও পূর্বসূরী মেজর রশীদের ন্যায় একই কায়দায় স্থায়ীভাবে ক্যাম্প নির্মাণ করে মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের ডেকে ভয়-ভীতি ও হুমকি দিয়ে মন্দির উচ্ছেদ ও ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাদের অশুভ তৎপরতা সাময়িক বন্ধ রাখলেও গোপনে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে মন্দির ভেঙ্গে ফেলে ফালিটাঙ্যা চুগ হতে চিরতরে বৌদ্ধ ধর্মের নাম নিদর্শনা মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানায়।

বিগত ঘূর্ণিঝড়ে ফালিটাঙ্যাচুগের অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির ছাউনীর ২/১টি টিন উড়ে গেলে তা মেরামত ও সংস্কার করতে গেলে লেঃ কর্নেল মোঃ রেজার নির্দেশে বিডিআর সদস্যরা বাধা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য পুরাকীর্তি ধরে রাখা উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকেরা ফালিটাঙ্যাচুগের চূড়ায় সুউচ্চ (বড়) বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করতে উদ্যোগ নিলে লেঃ কর্ণেল মোঃ রেজা তাতে বাধা প্রদান করে। এমনকি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে হুমকি দেয় যে, অবিলম্বে ফালিটাঙ্যাচুগ হতে ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দির উচ্ছেদ করা না হলে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে এবং অত্যন্ত ঔদ্ধ্যতপূর্ণ ভাষায় গালিগালাজ করে। সাত জন বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা দায়ের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলেও হুমকি দেয়। তার এহেন হুমকির ফলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহ প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা বিগত ৭ জুন ২০০৩ ও ২৫ এপ্রিল ২০০৪ বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পর পর দু'বার স্মারকলিপি পেশ করে। গত ৬ জুন ২০০৪ স্থানীয় নেকৃবৃন্দ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনও আয়োজন করে। কিন্তু আজ অবধি সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী হচ্ছে -

১। ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দিরের স্থলে স্থায়ী বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং মন্দির সীমানার মধ্যে অবস্থিত অস্থায়ী বিডিআর ক্যাম্প অবিলম্বে প্রত্যাহার করা।
২। বরকল উপজেলার বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দির উচ্ছেদকল্পে ক্ষতি সাধন ও ধর্মীয় পরিহানিকর ঘটনা তদন্তক্রমে আইনানুগ ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
৩। ভবিষ্যতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উল্লেখিত ধরনের ধর্মীয় অবমাননাকর কোন ঘটনা যাতে সংঘটিত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
৪। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১ (১) ক ও খ অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম প্রতিপালন ও নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার মান্য করা।
৫। ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে বিহার উচ্ছেদের হীন পরিকল্পনা বন্ধ করা।
৬। 'শহীদ সাত্তার টিলা' নামে নির্মিত পাকা ফিলারটি অনতিবিলম্বে উচ্ছেদ করে ফালিটাঙ্যাচুগ নাম বহাল রাখা।

উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলা সদরের দুই কিলোমিটার উত্তরে আকাশচুম্বী পাহাড়টির নাম হলো "ফালিটাঙ্যা চুগ"। কথিত আছে, কোন এককালে এই সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় জুমচাষীরা জুমতুলা-ভর্তি টুরুং (চাকমা ভাষায় 'ফালি') উঁচু মগডালে টাঙিয়ে রেখেছিল যা অনেক দূর থেকে দেখা যেত। ফালি টাঙানোর ফলে ঐ পাহাড়টি ফালিটাঙ্যা চুগ নামে পরিচিতি লাভ করে। চাকমা ভাষায় পাহাড় চূড়াকে "চুগ" বলা হয়। অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই পাহাড়টি বরকল উপজেলার সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়া। এর উচ্চতা ১৮৬৮ ফুট। এই মনোরম পাহাড়টি এমন একস্থানে অবস্থিত যেখান থেকে বরকল উপজেলার সবুজ বন বৃক্ষরাশি, পাহাড়ী জনপদ, উঁচু-নীচু পাহাড়, কাপ্তাই হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবলী একনজরে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পাহাড়ে সারা বছর সুশীতল বাতাস বইতে থাকে। প্রাকৃতিক অপূর্ব সৃষ্ট নৈসর্গিক পাহাড় চূড়াটি জনকোলাহল মুক্ত। মুক্ত পরিবেশ নির্মল বায়ু ইত্যাদি বিবেচনা করে বিগত ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ ফালিটাঙ্যা চুগে স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে বিদর্শন ভাবনা কুঠির ও বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঘাইছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠীর প্রহসন

এবারের বিজুর আনন্দ উপভোগ করতে পারলো না বাঘাইছড়ি উপজেলাবাসী। ১০ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে জনৈকা ফাতেমা বেগম হত্যাকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি জুম্মদের অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক হামলায় একটি এনজিও অফিসসহ পাঁচটি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। জানা যায় যে, জনৈকা ফাতেমা বেগমকে কে বা কারা খুন করার পর জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে রেখে আসে এবং সেটেলারদের মধ্যে প্রচার করা হয় যে, জুম্মরা ফাতেমা বেগমকে খুন করেছে। এতে মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। সেটেলাররা বাঘাইছড়ি উপজেলা শহরের জুম্ম দোকানগুলোতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এছাড়া হিলেহিলি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন নামক একটি উন্নয়ন সংস্থার অফিসেও লুটপাট চালায়। অন্যান্য যেসকল দোকান লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়-

১) হিলেহিলি কম্পিউটারস এন্ড স্টেশনারী ২) সৃজনী কম্পিউটার ও ফটোস্ট্যাট ৩) তারুমবন কম্পিউটার্স ও প্রিন্টার্স ৪) হিল ফ্যাশন আর্ট ও ৫) রাগিনী রেডিও এন্ড ওয়াচ সার্ভিস। এ সকল দোকানগুলো থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়।

এই সাম্প্রদায়িক হামলায় যারা নেতৃত্বে ছিল তারা হলো-

১) আজিজুর রহমান, সাবেক ইউপি চেয়রম্যান, পিতা- হ্বাজী তৈয়ব আলী, জীবঙ্গছড়া
২) গিয়াজ উদ্দিন, পিতা- বক্স আলী সরদার, মাস্টারপাড়া
৩) মোঃ মতিন, পিতা- হারুন মৌলভী, বাঘাইছড়ি মধ্যপাড়া
৪) মোঃ শাহ আলম, পিতা- এজাহার মিয়া, ঐ
৫) মোঃ জামাল(৩০), পিতা- সুন্দর আলী ভূঁইয়া, যুবদল নেতা, হাজীপাড়া
৬) মোঃ সেলিম (৩০), শ্রমিকদলের সভাপতি
৭) মোঃ সুরুজ মেম্বার (৪৫), সাবেক মারিশ্যা ইউপি সদস্য
৮) মোঃ রাজ্জাক (৪৫), গুচ্ছগ্রাম, সাবেক মারিশ্যা ইউপি সদস্য।

দোকানঘরগুলো লুটপাট ও ভাঙচুরের পর সাম্প্রদায়িক সেটেলাররা পার্শ্ববর্তী জুম্মগ্রাম বাবুপাড়ায় হামলার চেষ্টা চালায়। জুম্মরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসলে সেটেলাররা হটে যায়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারেরা মামলা দায়ের করতে চাইলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। শুধু তাই নয় তারা বলে যে, উপরোক্ত আসামীদের নাম মামলার দরখাস্ত থেকে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে পুলিশ জুম্মদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে এখন এলাকাবাসীদের হয়রানি করে চলেছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে ৩০ এপ্রিল ২০০৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মানিকলাল দেওয়ান, জেলা প্রশাসক ড. জাফর আহমদ খান ও পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির বাঘাইছড়ি সফর করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে একটি আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ লাখ টাকা বলে ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের অবহিত করেন। কিন্তু জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাত্র ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তিনি শুধুমাত্র ফাতেমা পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। জানা গেছে যে, এপর্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

পরে ৩০মে ২০০৪ আঞ্চলিক পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ও বাঘাইছড়ি সফর করে। প্রতিনিধি দলে প্রধান হিসেবে ছিলেন পরিষদ সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা। অপরাপর সদস্যরা হলেন আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য রওশন আরা বেগম, নুরুল আলম এবং এডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন। তাছাড়া স্থানীয় মুরুব্বীসহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সাথে কথা বলেন। তারা এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চিহ্নিত একটি সাম্প্রদায়িক মহলের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করেন।

জানা গেছে যে, ফাতেমা বেগম ও তার স্বামীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক সমস্যা চলছিল। ফাতেমা বেগমের স্বামী প্রায়ই হুমকী প্রদান করতো যে, তাকে হত্যা করে জুম্ম গ্রামে রেখে আসবে। এতে তার কিছুই হবে না। এসকল কথা ফাতেমা জুম্মদের কাছে কাজে গেলে প্রায়ই কেঁদে কেঁদে বলতো। তাই এলাকাবাসী মনে করে যে, পারিবারিক সমস্যার জের ধরে তার স্বামী ফাতেমাকে হত্যা করেছে এবং হত্যাকান্ডের ঘটনাটিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ধামাচাপা দেবার জন্যে জুম্মদের গ্রামে গোপনে লাশ রেখে আসে। ঘটনাটির জের ধরে বাঘাইছড়ি এলাকায় এখনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর উদ্যোগে ঢাকা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উদযাপিত হয়েছে। ঢাকায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এসকল অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সাংবাদিক সম্মেলন, র‍্যালী, আলোচনা সভা, ফিল্ম শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মত বিনিময় সভা। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভা।

ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলন

দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকায় ৭ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, সদস্য চৈতালী ত্রিপুরা ও জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি রূপায়ণ দেওয়ান।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে, বিশ্বের ৩০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসী জনগণের মতো বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবারও জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস ৯ আগস্ট জাতীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবারের দিবসের মূল সুর হলো, আমাদের ভূমি আমাদের জীবন। আদিবাসীরা ক্রমাগতভাবে নিজ ভূমি উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জীবন যেহেতু ভূমির সঙ্গে গ্রথিত, তাই ভূমি হারানো মানে আদিবাসীদের জীবন হারানো। ভূমি ছাড়া আদিবাসীদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও নিজস্ব জীবন প্রণালী আশা করা যায় না। আদিবাসীদের ভূমি রক্ষায় সরকার তো এগিয়ে আসছেই না, বরং ভূমিগ্রাসী শক্তিমানরাই নানাভাবে রাষ্ট্রের মদদ পাচ্ছে।

১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৪৯/২১৪ রেজুলেশনের মাধ্যমে ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে গ্রহণ করে। আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি অধিক মনযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এ দিবস ঘোষণা করা হয় এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে, বেসরকারি সংগঠন ও অন্যান্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় আদিবাসীদের ইস্যুতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য।

শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে, যেখানে বিশ্বের আদিবাসীরা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, সেসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়কে আদিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক দশক হিসেবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের মূল সুর হলো 'আদিবাসী জনগণ ঃ কর্মে অংশীদারিত্ব'।

জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত। ৩০টি ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটি ১৯৪৮ সালে গৃহিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের এই কথাগুলোর প্রতিফলন বাংলাদেশে আদিবাসীদের জীবনে নেই, দেশের সাধারণ হতদরিদ্র মানুষের জীবনেও নেই, পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশের মানুষের জীবনে নেই। মানবাধিকার কারও কারও কাছে দু'বেলা ভরপেট ভাত খাওয়ার সমান। এর বেশি চাওয়া তাদের নেই। এ ধারণাও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' এরকম প্রকল্প আজও আছে দরিদ্র মানুষের জন্য। যেন খাদ্য ছাড়া মানুষের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা বা অধিকার নেই। তাই দেখা যায় দরিদ্র অসহায় মানুষ, আদিবাসী জাতি যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, দেশে দেশে তারা ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন ও বৈষম্যের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের আদিবাসী বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত লিফলেটে প্রদত্ত তথ্যে জাতিসংঘ বলেছে, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে উপনিবেশিক আমল থেকেই আদিবাসীরা বহুমুখি শোষণ ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয় আদিবাসীরা হয়েছে উন্নয়নের নামে ধ্বংসের মুখোমুখি। বাঁধ, সংরক্ষিত এলাকা, পার্ক, ইকো-টুরিজম, সামাজিক বনায়ন, মিলিটারি বেস, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প - এসব নানা প্রকল্পের দ্বারা আদিবাসীদের উন্নয়ন তো হয়ইনি বরং তারা হয়েছে এসব কারণে উচ্ছেদের শিকার। তাদের গ্রাম, বসতভিটা, ফসলের ক্ষেত, বিচরণভূমি সব তারা হারিয়েছে, আর অসহায়ের মত মূলস্রোতের মানুষের 'উন্নয়ন

তান্ডব' তারা দেখেছে । এখন আদিবাসী ও বনের অধিবাসীদের বলা হয় 'পরিবেশ উদ্বাস্তু', যেখানে বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নের নামে আজ বিপন্ন।

বিগত ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে আদিবাসীদের মানবাধিকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন - এ ৬টি বিষয়ে কাজ শুরু করেছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের জন্য নতুন আইন ও কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে, তারা উন্নয়নে নতুন অংশীদারীত্ব লাভ করছেন। আমাদের দেশের সরকারও আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্বের বুকে সম্মানীয় আসন লাভ করতে পারে।

বিগত তিন বছর ধরে আমরা এ দিবস ঢাকায় জাতীয়ভাবে পালন করছি এবং সরকারের উদ্দেশ্যে আমাদের দাবি উত্থাপন করছি। দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি। কিন্তু শাসকশ্রেণী বরাবরের মতো আদিবাসীদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। বাংলাদেশের আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, ইকো-পার্কের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ, আদিবাসীদের উপর জুলুম নির্যাতন বন্ধ করা, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি অন্যতম। আদিবাসীদের এ সব দবি এখনও অর্জিত হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানবাধিকারের সাথে আদিবাসী জনগণ এবং উন্নয়নের সম্পর্ককে এখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে মানবাধিকার। যেখানে মানবাধিকার লংঘিত হয়, সেখানে সত্যিকার উন্নয়ন হতে পারে না। বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসী মানুষের অধিকারের কথা বলার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এখন জাতিসংঘের ভেতরেই। এই বিশাল অংশকে অধিকার বঞ্চিত রেখে বিশ্ব শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকার রক্ষা করা যাবে না। আদিবাসীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের গ্লানি থেকে সকল দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, আদিবাসীদের অবস্থা আমাদের দেশে ভালো নয়। এমনকি আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার তো দূরের কথা, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিটুকুও এখানে নেই। আদিবাসীরা পদে পদে শোষিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি কুলাউড়ায় খাসিয়া ও গারোদের পানপুঞ্জি ও জমি দখলের অপচেষ্টা চলছে। নার্সারি পুঞ্জির আদিবাসীরা এখনও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এ নিয়ে পত্রিকাতে রিপোর্টও হয়েছে, কিন্তু অবস্থার তেমন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। এর আগে ২০০০ সালে মৌলভীবাজার জেলায় ৭টি খাসিয়াপুঞ্জি ইকো-পার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু আদিবাসীদের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ঐ প্রকল্পের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখলেও সরকার এখনও প্রকল্পটি বাতিলের ঘোষণা দেয়নি।

সম্প্রতি মধুপুর বনে সরকার আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চলেছে। প্রকল্পের নাম মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক। এই প্রকল্পের ১ নম্বর লক্ষ্য হলো মানুষের বিনোদন সম্প্রসারণ। কিন্তু সরকার প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বা বাস্তবায়নের সময় আদিবাসী বা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কোনো আলাপ আলোচনা করেনি। জোর করেই সরকার মধুপুর বনে দেয়াল নির্মান শুরু করে। আদিবাসীরা পরবর্তীতে মিলিতভাবে এ প্রকল্পের বিরোধিতা করে। গত ৩ জানুয়ারী ২০০৪ মধুপুরে গারোদের মিছিলে পুলিশ ও বনরক্ষী নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে গারো যুবক পিরেন স্নাল নিহত হন এবং আদিবাসী নারী-শিশুসহ ৩০ জন আহত হন। পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র উৎপল নকরেক চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে। এর কোনো বিচার এখনও হয়নি, বরং উল্টো আদিবাসীদের নামে ১৫টি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। আদিবাসীদের দাবি হলো, বনের মধ্যে দেয়াল নির্মাণসহ প্রকব্বাস্তবায়ন করা হলে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হবে, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন মারাত্মক ব্যাহত হবে এবং চূড়ান্তভাবে আদিবাসীরা বন থেকে এবং নিজেদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থাও আশাব্যঞ্জক নয়। অনেক আশা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছিল, কিন্তু চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, চুক্তি প্রকাশ্যে লংঘিত হচ্ছে। অপারেশন উত্তরণের নামে অদ্যাবধি সেখানে সেনা শাসন অব্যাহত রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয় -

১। অবিলম্বে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।
২। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার স্বীকার করতে হবে। যেখানে আদিবাসীদের ভূমির স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে আদিবাসীদের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।
৩। মধুপুরসহ আদিবাসী ভূমিতে ইকো-পার্ক নির্মান বাতিল করতে হবে।
৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫। সারাদেশে আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, ভূমি দখল ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের ন্যায় সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় এবং একটি ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

৭। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা কতে হবে।

৮। আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আদিবাসীদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্পে আদিবাসীদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকায় বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা

৯ আগষ্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উদ্বোধন ঘোষণা করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। আরও বক্তব্য রাখেন আদিবাসী নেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা, বাবলী, রামেন্দু মজুমদার, সিপিবি সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান প্রমুখ। এরপর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীটি শাহবাগ ঘুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে এসে সমাপ্ত হয়। এখানে বিকেলে ফিল্ম শো আয়োজিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপরে ডেনমার্কের জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক তৈরী 'ডিমান্ডিং জাস্টিস' নামে একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শিত হয়। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণফোরাম নেতা ও বাংলাদেশ সংবিধানের রূপকার ড. কামাল হোসেন। আর উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ইয়ুর্গেন লিজনার, ডেনিস দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

এরপর বিভিন্ন আদিবাসীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তারপরের দিন সিরডাপ মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষাপটে ভূমি, জনমিতি ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ বিষয়ে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আদিবাসী বিষয়ক গবেষক ও সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. স্বপন আদনান।

রাঙ্গামাটিতে র‍্যালী ও আলোচনা সভা

দিবসটি উপলক্ষ্যে আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক রাঙ্গামাটিতে র‍্যালী ও আলোচনা আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে দিবসটির কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক নির্মলেন্দু ত্রিপুরা। উদ্বোধনের পর পরই শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয় এবং পৌর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালীতে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, উন্নয়ন সংগঠন যোগদান করেন।

এরপর রাঙ্গামাটি পৌর মিলনাতয়নে উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক উষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে দিবসটির তাৎপর্যের উপর শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা অধ্যাপক হামিদা বানু এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, উপজাতীয় সামাজিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দেওয়ান, বিশিষ্ট লেখক বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী মাধবী লতা চাকমা, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী শিশির চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভায় উপস্থাপনায় ছিলেন সজীব চাকমা।

মাটিরাঙ্গার সিন্ধুকছড়িতে ১৪ জুম্ম পরিবারের জমি বেদখল হতে চলেছে

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে সেটেলার বাঙালীদের ভূমি বেদখলের ঘটনা নতুন নয়। সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার সিন্ধুকছড়িতে সেনাবাহিনীর উস্কানী ও সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালীদের ভূমি বেদখলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই এলাকায় কুখ্যাত সেটেলার সর্দার ১) মো. সুরুজ আলী, পিতা- মৃত সেলিম উদ্দিন, ২) মো. আলতাফ সিকদার, পিতা মৃত আবেদ আলী এবং ৩) মো. হারুন সিকদার এর নেতৃত্বে সেটেলাররা নিম্নোক্ত জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করে নিয়েছে।

১) পরানজয় ত্রিপুরা, পিতা-মৃত সিঞ্চি অংশ ত্রিপুরা
২) রহেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা- ঐ
৩) কালেনজয় ত্রিপুরা, পিতা- সুই প্রু ত্রিপুরা
৪) শান্তি কুমার ত্রিপুরা, পিতা- পতিকুমার ত্রিপুরা
৫) তালান কুমার ত্রিপুরা, পিতা- ঘোনাচিং ত্রিপুরা
৬) অরেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা-পরচন্দ্র ত্রিপুরা
৭) বিরনজয় ত্রিপুরা, পিতা-নল চন্দ্র ত্রিপুরা
৮) মংক্যথোয়াই ত্রিপুরা, পিতা- মৃত নগেন্দ্র কার্বারী
৯) যতন কুমার ত্রিপুরা, পিতা- রাসা কুমার ত্রিপুরা
১০) সুরেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা-সাধনচন্দ্র ত্রিপুরা
১১) বীরসেন ত্রিপুরা, পিতা- জয়ন্তকুমার ত্রিপুরা
১২) রানে মোহন ত্রিপুরা, পিতা- চাইপ্রু ত্রিপুরা
১৩) সঞ্জিত ত্রিপুরা, পিতা- উন্দু কুমার ত্রিপুরা
১৪) অংথোয়াই ত্রিপুরা।

ভূমিহারা জুম্ম পরিবারেরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে এর প্রতিকার দাবী করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেদখলকৃত জায়গা পরিদর্শন করেন এবং গুইমারা থানার এসআই নিজাম উদ্দিনকে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরই সূত্র ধরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ২৪/০৮/০৪ তারিখে এবং পুলিশ সুপারের অফিস থেকে ২৬/৮/০৪ তারিখে নিম্নোক্ত ১১ জন সেটেলার বাঙালী ও জুম্মদের বিরুদ্ধে সীমানা অতিক্রম না করার নির্দেশ জারী করে এসআই নিজাম উদ্দিনকে অফিসাদেশ জারী করা হয়। এতে আরও বলা হয় যে, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

১) মো. আব্দুল হাই
২) মো. পুরঞ্জয় ত্রিপুরা
৩) মো. রহেন্দ্র ত্রিপুরা
৪) অংথোয়াই ত্রিপুরা
৫) নুরুল ইসলাম
৬) জামাল উদ্দিন
৭) আব্দুল করিম
৮) তৈয়ব আলী
৯) আকরাম আলী
১০) সুরুজ আলী
১১) আলতাফ সিকদার

কিন্তু সেটেলারদের মধ্যে আলতাফ আলী উক্ত আদেশ অমান্য করেন এবং রহেন্দ্র ত্রিপুরার ভূমি বেদখল করেন। সে রহেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীও ভেঙে দেয়। অন্যদিকে সিন্ধুকছড়ি আর্মী ক্যাম্প থেকে জুম্মদের উপর চাপ দেয়া হচ্ছে যেন তারা এলাকাটি ছেড়ে চলে যায়। তারই সূত্র ধরে সিন্ধুকছড়ি জোনের এডজুট্যান্ট শাহীন ৪/৫/০৪ তারিখে রহেন্দ্র ত্রিপুরাকে ডেকে নিয়ে ২০/৫/০৪ তারিখের মধ্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, সেটেলারদের ছেলেরা হারুন সিকদারের ছেলের নেতৃত্বে রহেন্দ্র ত্রিপুরার কন্যাকে মারধোর করে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য চাপ দেয়। তারা তারও গাছও কেটে নিয়ে যায়। রহেন্দ্র ত্রিপুরা জেলা প্রশাসকের কাছে উক্ত কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে নিস্তার পাবার আবেদন জানান। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। কেননা সামরিকবাহিনী এই এলাকায় মোতায়েন থাকলে ও সাধারণ প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করলে কোন বেসামরিক প্রশাসনই ঠিকমতো চলতে পারে না।

ভূমি বেদখলকল্পে নাইক্ষ্যংছড়িতে মারমা পাড়ার উপর বাঙালীদের হামলা

গত ২৭ আগষ্ট ২০০৪ দুপুর ১২টার দিকে বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়ন অন্তর্গত ঈদগড় মৌজার ডুলুঝিরি মারমা পাড়ায় ৮টি পরিবারের উপর বেদার মিয়া ওরফে খুনী মুজাফ্ফার, জসিম, পিতা- মৃত আবদুল আজিজ ও ইউপি মেম্বার মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল সেটেলার বাঙালী হামলা চালায়। হামলাকালে বাঙালীরা মারমা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে গরু, ছাগল, মহিষ, মুরগী, ধান, চাল, পাম্প মেশিন ও আববাবপত্রসহ বাড়ীর মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। হামলার পর ভয়ে উক্ত ৮টি মারমা পরিবার গ্রামছাড়া হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। উক্ত মারমা পরিবারসমূহ গ্রামে ঢুকলে পুনরায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে তারপর দিন ২৮ আগষ্ট সেটেলার বাঙালীনা পথে ওৎ পেতে থাকে। উল্লেখ্য, ডুলুঝিরি মারমা পাড়ার অধিবাসীরা একজন বাঙালীকে খুন করেছে মর্মে মিথ্যা ও বানোয়াট অপপ্রচার চালিয়ে বাঙালীরা এই অভিযান চালায়। বস্তুতঃ আতঙ্ক সৃষ্টি করে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে মারমাদের জায়গা-জমি বেদখলের উদ্দেশ্যেই এই হামলা করা হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। হামলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ হলো-

(১) মংথোয়াইচং কার্বারী পিতা খ্যাংচিং প্রু

(২) আথুই মারমা স্বামী মৃত আলুমং

(৩) মাইঞো মারমা স্বামী মৃত অংক্যউ

(৪) মাথুই মারমা স্বামী মৃত ফচিং মারমা

(৫) ফচারি মারমা পিতা মৃত থোয়াইচামং মারমা

(৬) শৈচিং অং মারমা পিতা অংচিং মারমা

(৭) ক্যজ প্রু মারমা পিতা চাইখই মারমা ও

(৮) হ্লামা মারমা স্বামী হ্লাথোয়াই মারমা।

সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচন: সাম্প্রদায়িকতার বিজয়

এবছরের ৬ অক্টোবর ও ৭ অক্টোবর যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হলো। পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় প্রচারণার চাইতে সাম্প্রদায়িকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ক্রমবর্ধমান বাঙালী অনুপ্রবেশের ফলে জুম্মরা যে গণতান্ত্রিক অধিকার হারা হয়ে পড়ছে তারও নজির দেখা গেলো এবারের নির্বাচনে। বিশেষ করে রাঙামাটি পৌর নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জুম্মরা প্রার্থী হবার আশাও ছেড়ে দেয়। তাছাড়া স্থায়ীবাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবীকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতি বিগত সাধারণ নির্বাচন থেকে নীতিগতভাবে নির্বাচন বর্জন করে চলেছে। অপরদিকে বহিরাগত বাঙালীদের স্বার্থের দোহাই তুলে আর সমঅধিকারের ঝান্ডা উড়িয়ে সাম্প্রদায়িক মহল নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে সামরিক আমলারা মনে করেছিল যে, জনসংহতি সমিতি প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। তাই তারাও চেয়েছিল দলীয় ব্যানারের বাইরে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাঙালীদের সংগঠিত করতে।

রাঙামাটিতে পাহাড়ীদের মধ্যে কেউ কেউ ধারণা করেন যে, বাঙালীদের দুই বা ততোধিক চেয়ারম্যান প্রার্থী রয়েছেন তাই তাদের ভোটার সংখ্যা বেশী হলেও কেবলমাত্র একজন পাহাড়ী প্রার্থী নির্বাচনে অবতীর্ণ হলে জয়লাভ করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোট পেলে জয়টা সুনিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসা যাক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বরাবরের মতোই দেখা গেছে যে, পাহাড়ীদের স্বার্থের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেনি। যদিও তারা দেশের অপরাপর অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ভীড় জমাচ্ছেন কিন্তু এখানে এসে পাহাড়ীদের স্বার্থের সাথে তাল মিলাচ্ছেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে পাহাড়ীদের স্বার্থের প্রতিকূল হচ্ছেন। অপরদিকে বাঙালীরা দুইজনের অধিক সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরিশেষে তারা সবাই দলমত ভুলে বাঙালী হয়ে যায়। এখানে তাই কোন দল জয়লাভ করে না; জয়লাভ করে সাম্প্রদায়িকতা। এবারে রাঙামাটিতে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই তুলে নিজের কোলে ঝোল টানলেন হাবিবুর রহমান হাবিব। আর খাগড়াছড়িতে তো খোদ ওয়াদুদ ভূঁইয়া ভোট কেন্দ্রে পরখ করেছেন কোন ভোটার কোথায় ভোট দিচ্ছেন। ওয়াদুদ সমর্থিত প্রার্থী ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা খাগড়াছড়িতে পোস্টারও টাঙাতে পারেনি। সেখানে সুবিধাবাদী পাহাড়ী প্রার্থীরা ভোটের হিসাব না কষে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার লেজে কে বেশী ধরে থাকতে পারেন তার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেন। ফলে খোদ পাহাড়ী ভোটারাই তাদের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। #

সাংগঠনিক সংবাদ

ইউএনডিপি'র উচ্চ পর্যায় মিশনের সাথে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

গত ৪-১৬ জানুয়ারী ২০০৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কস্থ ইউএনডিপি-র হেডকোয়ার্টার থেকে তিন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি মিশন "পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন প্রসার এবং আস্থা প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত বিরাজমান সমস্যা পর্যালোচনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। ইউএনডিপির অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিজ শেলী টিম্পসনের নেতৃত্বে অপর দু'জন সদস্য হচ্ছেন জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিজ এলিজাভেট স্ট্যামাটোপোলো এবং ফিলিপাইনস্থ টেবটেব্বা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, ইউএনডিপির সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী তহবিলের চেয়ারপার্সন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ মিজ ভিক্টোরিয়া টাওলি কর্পুজ।

উল্লেখ্য যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন প্রসার এবং আস্থা প্রতিষ্ঠা" নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং গত ১৪ জুন ২০০৩ তারিখ এ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এ প্রকল্প উদ্বোধনের পর এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং ইউএনডিপির আদিবাসী বিষয়ক পলিসির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে অভিযোগ উঠে। এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্কস্থ ইউএনডিপি-র হেডকোয়ার্টার-এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য এই উচ্চ পর্যায়ের মিশনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর কালে ইউএনডিপি'র এই মিশন ৫ জানুয়ারী ২০০৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে এবং ৮ জানুয়ারী জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাঙ্গালী প্রতিনিধি, প্রথাগত নেতৃবৃন্দ, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মিশনের সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পুনঃরায় নিম্নোক্ত দাবীসমূহ ইউএনডিপি'র উচ্চ পর্যায় মিশনের নিকট তুলে ধরা হয় -

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সেভাবে ইউএনডিপি'র উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২। কেবল আদিবাসী জুম্ম জনগণ এবং স্থায়ী বাঙ্গালী অধিবাসীদের সুবিধাভোগী রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া। প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া -
   (১) আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু,
   (২) ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী,
   (৩) ফরেষ্ট ভিলেজার,
   (৪) জুম চাষী পরিবার,
   (৫) কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ,
   (৬) দরিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করে এমন ভূমিহীন ও গরীব স্থায়ী অধিবাসী,
   (৭) অপেক্ষাকৃত সুবিধা বঞ্চিত স্বল্প জনসংখ্যার আদিবাসী জাতিসমূহের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,
   (৮) জনসংহতি সমিতির Ex-combatant পরিবারসমূহ।

৩। উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, আদিবাসী সংগঠনসমূহের সিদ্ধান্তগ্রহণসহ পূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

৪। পার্বত্যবাসীর 'স্বাধীন ও পূর্বাবহিতকরণপূর্বক সম্মতি' নীতির ভিত্তিতে সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করা এবং আদিবাসী ভাষা কিংবা আদিবাসী ও এখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা বুঝতে পারে এমন ভাষায় ইউএনডিপি'র দলিলপত্রাদি সরবরাহ করা।

৫। প্রকল্প থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি'র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট/কমিটি বাতিল করা।

৬। যৌথ ঝুঁকি নিরূপণ মিশনের রিপোর্টের আপত্তিকর বিষয়গুলো সংশোধন করা।

১৯ ও ২০ জানুয়ারী তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতির সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করার বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পূর্ব ঘোষণানুসারে তিন পার্বত্য জেলায় ১৯ ও ২০ জানুয়ারী সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। কতিপয় স্থানে সরকারের একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক মহলের প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলার বাঙালী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ-এর সড়ক অবরোধ বিরোধী ব্যর্থ অপচেষ্টা ব্যতীত অবরোধ কর্মসূচী শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। পূর্বের মতো পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধ কর্মসূচীতে সামিল হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তিন পার্বত্য জেলায় কোন যানবাহন চলাচল করেনি।

সরকারের একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মহলের প্রত্যক্ষ মদদে কায়েমী স্বার্থান্বেষী কতিপয় সেটেলার বাঙালী জনসংহতি সমিতির ঘোষিত সড়ক অবরোধ কর্মসূচী বানচাল করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। তারা কখনো পার্বত্য গণ পরিষদ, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, পার্বত্য ছাত্র পরিষদ কিংবা কখনো চারদলীয় জোটের নামে বিভিন্ন জনসভার মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির ঘোষিত গণতান্ত্রিক কর্মসূচী কঠোরভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা প্রদান করে। তারই অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালীসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রাণীর হাট থেকে গাড়ী বহর নিয়ে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে তথাকথিত 'রুট মার্চ' করে সড়ক অবরোধ বানচাল করার অপচেষ্টা চালায়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে উক্ত মহল কর্তৃক ১৮ জানুয়ারী সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি শহরে মুখোশ পরিহিত অবস্থায় বেবীট্যাক্সি যোগে মাইকিং করা হয় যে, জনসংহতি সমিতির সড়ক অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয়েছে। অপরদিকে অবরোধ পালনকালে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার বড়ইছড়িতে রফিক ও আকবর এর নেতৃত্বে একদল সেটেলার বাঙালীরা জনসংহতি সমিতির পিকেটারদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে অংথোয়াই চিং মারমা নামে একজন সদস্য মাথায় গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ চলাকালে বিনা উস্কানীতে পুলিশ পিকেটিংকারী প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ধাওয়া করে এবং এক পর্যায়ে জুম্ম শরণার্থী পিকেটার ও জনসংহতি সমিতির জেলা অফিস লক্ষ্য করে পুলিশ টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এতে কয়েকজন পিকেটার আহত হয়। এ হামলাকালে পুলিশ সেটেলার বাঙালীদের পিকেটারদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার চেষ্টা চালায়। এতে কিছু সময়ের জন্য খাগড়াছড়ি শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের এই সাম্প্রদায়িক তৎপরতার ফলে পাহাড়ী-বাঙালী লোকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

জনস্বার্থে জনসংহতি সমিতির সড়ক অবরোধ কর্মসূচী সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়। তাই সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে তিন পার্বত্য জেলার সকল স্থান থেকে পিকেটিং তুলে নেয়া হয়। কিন্তু দৈনিক পূর্বকোণ, জনকণ্ঠ ও সংবাদ ইত্যাদি দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয় যে, সন্ধ্যা ৭টায় রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে রাঙামাটি ফিরে আসার পথে বিয়ের গাড়ী লক্ষ্য করে অবরোধকারীরা গুলি চালায় এবং পরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বাসের গ্লাস ভাংচুর করে। এই সংবাদ সর্বৈব ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এছাড়া এসব বিয়ের গাড়ীগুলো যাতায়াতের জন্য জনসংহতি সমিতি কর্তৃক অনুমতি দেয়া হয়। সুতরাং অবরোধকারী কর্তৃক গাড়ী লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা বা গুলি চালানো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অপরদিকে উক্ত বাস দু'টির চালক খোরশেদ আলম ও মফিজুর রহমান জানিয়েছেন যে, গাড়ী লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষিপ্ত হলেও গুলি চালানোর সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। জনসংহতি সমিতির ভাবমুর্তিকে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে অবরোধ বিরোধী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হতে পারে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটাকে গুলি বর্ষণের সংবাদ হিসেবে প্রচার করা হয় বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ডাকে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরাও চুক্তি মোতাবেক যথাযথভাবে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রেশন সরবরাহের দাবীতে ১৯ ও ২০ জানুয়ারী হরতাল পালন করে। কিন্তু চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ শরণার্থীদের হরতাল প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ জারী করে। অন্যাথায় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে ইউপিডিএফের জেলা কম্যান্ডার অনিল চাকমা ওরফে গোর্গি হুমকি দেয়। এতে শরণার্থীদের মধ্যে চরম ভীতি দেখা দেয়।

মধুপুরে আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ ও বন রক্ষীদের গুলীতে আদিবাসী যুবক পীরেন স্নান এর মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

গত ৩ জানুয়ারী ২০০৪ টাঙ্গাইলের মধুপুরে ইকো পার্ক নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ ও বন রক্ষীদের গুলীতে আদিবাসী যুবক পীরেন স্নান এর মৃত্যু ও কমপক্ষে ২০ জন আদিবাসী আহত হওয়ার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

টাঙ্গাইলের মধুপুরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ইকো পার্ক নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীরা শুরু থেকেই বিরোধিতা করে আসছে। এই এলাকায় ইকো পার্ক নির্মিত হলে আদিবাসীরা তাদের বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসা চিরাচরিত ভূমি থেকে উচ্ছেদ

হয়ে পড়বে এবং এতে করে তাদের জীবন, সম্পত্তি ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। শুরু থেকেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীরা সরকারের কাছে প্রতিবাদ ও প্রকল্প বাতিলের দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত না করে প্রকল্পের বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ শুরু করে। এই বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণের বিরুদ্ধে মধুপুরের জয়নাগাছা এলাকায় আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ মিছিল চলাকালে পুলিশ ও বনরক্ষীরা গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে পীরেন স্নান ও উৎপল নকরেক গুরুতরভাবে আহত হয় এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে পীরেন স্নাল মারা যায়।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং তাদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বিপন্ন করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই আদিবাসীদের স্বার্থ পরিপন্থী ইকো পার্ক প্রকল্পের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের চলমান আন্দোলনের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং নিহত ও আহত পরিবার-পরিজনদের গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে। ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারসমূহকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, আহত ব্যক্তিদের যথাযথ ও দ্রুত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা ও আদিবাসী স্বার্থ পরিপন্থী ইকো পার্ক প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করার জন্য জনসংহতি সমিতি পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়।

সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মানিক চন্দ্র সাহাকে নৃশংসভাবে হত্যাকান্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ১৫ জানুয়ারী ২০০৪ খুলনায় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক বোমা হামলা চালিয়ে খ্যাতিমান সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মানিক চন্দ্র সাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। মানিক চন্দ্র সাহার মতো একজন প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীকে হত্যা করা সমগ্র জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এই অপূরণীয় ক্ষতি কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আরেকবার প্রমাণিত হলো দেশে সাধারণ মানুষের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই এবং দেশের জাগ্রত বিবেককে চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণসহ মানিক চন্দ্র সাহার হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায়। সেই সাথে প্রথিতযশা সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মানিক চন্দ্র সাহার পরিবার পরিজনদের প্রতি জানায় গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

নয়া দিল্লীতে বিডিআর মহাপরিচালক কর্তৃক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে দেয়া বিবৃতির প্রতিবাদ

ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে বিডিআর-বিএসএফএর মহাপরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বিডিআর মহাপরিচালকের দেয়া সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বিবৃতির বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। ১০ জানুয়ারী ২০০৪ দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, The Daily Star, The Bangladesh Observer, প্রথম আলো, জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক জানা যায় যে, প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন - ১৯৯৮ সালে যে সব শান্তিবাহিনী সদস্য বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেনি এবং যারা আত্মসমর্পণের পরে আবার ফিরে এসেছে তারা যৌথভাবে ভারতে বসে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় সক্রিয় উপজাতীয়দের সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতিকে পুনর্গঠিত করতে সহায়তা করছে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ বিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে। [The remaining Shanti Bahini insurgent elements, who had not surrendered in 1998 and stayed back in India, together with some who had rejoined them after surrendering, were getting organized under the banners of two insurgent groups – United Peoples' Democratic Front (UPDF) and Jana Samhati Samity (JSS). These groups were conducting terrorist activities against Bangladesh with assistance from Indian intelligence outfits]। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হচ্ছে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। তাই এ সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাই চুক্তি স্বাক্ষরের পর জনসংহতি সমিতি সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য প্রদান সম্পূর্ণ অবাস্তব, অযৌক্তিক ও ষড়যন্ত্রমূলক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য সরকারের কাছে সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদান ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাসহ চুক্তি মোতাবেক করণীয় সকল দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। আরো

উল্লেখ্য যে, চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দেশের বাইরে ও ভিতরে অবস্থান করে বাংলাদেশ বিরোধী কোন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়নি। এছাড়া প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সহধর্মিনীও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে বিডিআর মহাপরিচালক যে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন তা সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর পরিবারের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিপ্রায় বৈ কিছুই নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

ইহাও উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে চুক্তি মোতাবেক সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারসহ চুক্তির অন্যান্য বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিরাপত্তাবাহিনীর একটি মহলসহ সরকারের কায়েমী গোষ্ঠী গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে এই বিশেষ মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃত্রিম অশান্ত পরিস্থিতি বজায় রাখার্থে ইউপিডিএফ নামধারী একটি সন্ত্রাসী গ্রুপকেও নানাভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এই বিশেষ মহলের প্রত্যক্ষ মদদে ২০০১ সালে ইউপিডিএফ কর্তৃক তিন বিদেশী অপহরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের উপর খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হচ্ছে। অপরদিকে সেনা সন্ত্রাসসহ বাঘাইহাট, বাবুছড়া, বোয়ালখালী, রামগড়, ভূয়াছড়ি ও মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক সহিংস কার্যকলাপ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি উক্ত বিশেষ মহল কর্তৃক সংঘটিত হয়ে আসছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপের তৎপরতা রয়েছে বলে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণ অব্যাহত রাখা, অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার না করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যেই বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মতো একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবারের বিরুদ্ধে উক্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন জনগণ মনে করছে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিন আসন জুম্ম মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবী

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য প্রতিটি জেলায় ১টি করে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি আসন সংরক্ষণ, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিন মহিলা আসন জুম্ম মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০-এর পরিবর্তে ৪৫০-এ বাড়ানোর জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের দু'টি বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়। পৃথক দু'টি বিলের একটিতে জাতীয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা ৩০০ এর পরিবর্তে ৪০০ আসন এবং অপরটিতে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়।

গত ১৭ জানুয়ারী ২০০৪ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অভিমত ব্যক্ত করে যে, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করা অত্যন্ত জরুরী। দেশের আপামর জনগণ সেটাই দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছে। কিন্তু ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে সরকার জাতীয় সংসদের আরো ১০০টি আসন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় সংসদের আরো ১০০টি আসন বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত ১০০ জন নেতা-কর্মীর রাজনৈতিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও বাস্তবে এতে করে দেশের গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। এছাড়া জাতীয় সংসদের বর্তমান ৩০০ আসন সংখ্যা জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যথাযথ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। অধিকন্তু বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এ দেশের বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এমন একটি দেশে জাতীয় সংসদের আরো ১০০টি আসন বৃদ্ধি করা অর্থনৈতিক দিক থেকে অপচয় বৈ কিছু নয়। তাই জাতীয় সংসদের আরো ১০০টি আসন বৃদ্ধি করার সরকারের এই প্রস্তাব কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। অপরদিকে মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ করা এবং উক্ত সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহিলাদের জন্য প্রতিটি জেলায় ১টি করে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি আসন সংরক্ষণ এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিন মহিলা আসন উপজাতীয় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবী অনেক আগে থেকেই করে আসছিল।

৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতির সর্বাত্মক সড়ক অবরোধ পালিত

পূর্ব ঘোষণানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি সহিংস হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারন করা এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; (৩) অবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করার দাবীতে ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ইং তিন পার্বত্য জেলায় দু' দিনব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী শান্তি পূর্ণ ও সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথমে ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। পরে জনগণের অনুরোধে এবং জনসআর্থে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে লোকের গমনাগমনের সুবিধার্থে ঘোষিত তিনদিনের মধ্যে ৭ ফেব্রুয়ারী অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয়।

অবরোধের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ একই দাবীতে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এবং দেশের বিভিন্ন বরেণ্য ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে রাঙামাটিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা দেয়া হয়।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২৩ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটিতে জনসংহতি সমিতির জনসভা অনুষ্ঠিত

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ অপরাহ্ন ১.০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন; সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ; অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করার বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আজ রাঙ্গামাটিতে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

জনসভায় অন্যান্যে মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনীতি বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার, কেন্দ্রীয় সদস্য কে এস মং মারমা এবং আইন ও ভূমি বিষয়ক সহ সম্পাদক এ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা, বিশিষ্ট সমাজসেবক নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, সিপিবি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দীলিপ দেব, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ইউসুফ আলম ও রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ সভাপতি জাকের হোসেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা। জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা এবং সভা পরিচালনা করেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা। জনসভা শুরুর পূর্বে গণসংগীত পরিবেশন করেন গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী। রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সকাল থেকে শত শত নারী পুরুষ সমাবেশে যোগদান করেন।

বক্তারা অনতিবিলম্বে দাবী পূরিপূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং দাবী আদায়ের আন্দোলন চলতে থাকবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, বক্তারা রাঙ্গামাটিস্থ উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে আসার পথে গণফোরাম সভাপতি ও বরেণ্য আইনজীবি ডঃ কামাল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পাটির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় সদস্য ও আদিবাসী বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক খগেশ কিরণ তালুকদার, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পাটির অন্যতম নেতা ডঃ আক্তার সোবহান খান মাসরুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সাইদুর রহমানসহ মানবাধিকার কর্মী নজরুল কবীর এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাই প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের উপর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সীমান্তে কাউখালী উপজেলাধীন রাবার বাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' ও 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ' নামক নামসর্বস্ব ও উগ্র সাম্প্রদায়িক দু'টি সংগঠনের একদল সন্ত্রাসী পিকেটার কর্তৃক হামলা চালিয়ে তাদের গাড়ী ভাংচুর ও প্রাণনাশের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

সভায় জনসংহতি সমিতির সভাপতি বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করার প্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দিন দিন পরিস্থিতির চরম অবনতি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এজন্য তিনি সরকারের বিশেষ মহলকে দায়ী করেন। তিনি অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যথাযথ দৃষ্টি প্রদানের আহ্বান রাখেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উল্লেখিত দাবী পূরণ না হওয়া

পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি ডঃ কামাল হোসেনসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর আজকে সংঘটিত হামলা ও প্রাণনাশের অপচেষ্টা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন। এ বিষয়ে তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আগামী কাল ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রোজ মঙ্গলবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণসংযোগ; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত করা; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত জোরদার করা এবং এসএসসি পরীক্ষা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় উৎসব বিজু, সাংগ্রাইং, সাংগ্রং ও বৈসুর পর পরই উল্লেখিত চারটি দাবীতে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে জনসভায় ঘোষণা প্রদান করা হয়।

ড. কামাল হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারী তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল পালিত

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙামাটি জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর হামলা ও পাল্টা সড়ক অবরোধ কর্মসূচীর প্রতিবাদে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচী পালিত হয়।

জনসংহতি সমিতির হরতাল পালনের শেষ পর্যায়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে রাঙামাটি জেলা জনসংহতি সমিতির সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি রূপায়ণ দেওয়ান, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ইউসুফ আলম, রাঙামাটি জেলার বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক দীলিপ দেব, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলার সভাপতি আসীন চাকমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের জন্য রাঙামাটি জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বক্তারা হরতাল কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে উক্ত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবী জানান এবং চুক্তিবাতিল দাবীকারী সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে সরকারের এক বিশেষ মহলের যোগসাজশে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকীর পয়েন্ট অব অর্ডারের জবাব দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, 'রাঙ্গামাটি জেলায় শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন'র কর্মসূচী চলাকালে ড. কামালের গাড়ী বহরের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে চুক্তিবাতিল দাবীকারীদের সংঘর্ষ হয়। কামাল হোসেনের সফরসঙ্গী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটির প্রবেশ পথে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট কর্মসূচী পালনকারী জনতার উপর হামলা করেছে। জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন। সন্ত্রাসীদের মদতদানে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিকৃত ও বানোয়াট বিবৃতি প্রদান করেছেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙামাটিতে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিতে আসার সময় রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার রাবারবাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে 'সমঅধিকার আন্দোলন' ও 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ' এর একদল সন্ত্রাসী গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন, গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় সদস্য খগেশ কিরণ তালুকদার, ওয়াকার্স পার্টির নেতা ডঃ আক্তার সোবহান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সাঈদুর রহমান, মানবাধিকার কর্মী নজরুল কবীর এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই প্রমুখ ব্যাক্তিবৃন্দের উপর হামলা ও প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। শুধু তাই নয়, সমঅধিকার আন্দোলন নামধারী সাম্প্রদায়িক, চুক্তিবিরোধী ও সন্ত্রাসী সংগঠনটির সন্ত্রাসীরা কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা ও বাঙ্গালহালিয়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ২২টি বাস যোগে জনসভায় যোগ দিতে আসা লোকজনদেরকে বাধা প্রদান করে।

তিন পার্বত্য জেলায় নারী দিবস পালিত

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ তিনি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন নারী সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজন করে।

'নারী সমাজের উপর সকল প্রকার রাষ্ট্রীয়, জাতিগত ও সামাজিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন' - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেযারেশন এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী মাধবী লতা চাকমার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী হলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক নির্মলেন্দু ত্রিপুরা। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ শেখর চাকমা,

মহিলা সমিরি সাধারণ সম্পাদিকা উমে মং, মহিলা সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডাশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যা রওশন আরা বেগম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলার সভানেত্রী কনিকা বড়ুয়া ও আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের নেত্রী খুশী নাহার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভার বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নারী-পুরুষ সমাজের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কিন্তু সারা বিশ্বে সভ্যর উষালগ্ন থেকেই নারী সমাজ রাষ্ট্রীয়, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক সহিংসতার শিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে জুম্ম নারী সমাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালী কর্তৃক প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, অপহরণ, হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে বক্তারা জানান। উল্লেখ্য যে, আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য জুরাছড়ি উপজেলা থেকে ট্রলার যোগে আসার পথে সুভলং ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ট্রলার থামিয়ে অংশগ্রহণকারীদের হয়রানি করে। একপর্যায়ে সেনা সদস্যরা ট্রলারের চালককে মারধর করে।

একই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ বিভিন্ন নারী সংগঠন যৌথভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রথমে সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ এম এন লারমার পাদদেশ থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাব প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এরপর অপরাহ্ন ১টায় দিবসটি তাৎপর্যের উপর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জ্যোতিপ্রভা লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, প্রবীন শিক্ষবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরা, হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি নির্মল দাশ, জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জড়িতা চাকমা, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির শেফালিকা ত্রিপুরা, মিলনপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির ইন্দিরা চাকমা, সমাজকর্মী সরলা তালুকদার, কালিন্দী রাণী চাকমা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, পারনছড়ি থেকে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার সময় দেওয়ান পাড়া স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা অংশগ্রহণকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে।

বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ সভানেত্রী ওয়াইচিং প্রু মারমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যা উনুপ্র মারমা। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য লয়েল ডেভিড বম, উছো মং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সেনা দপ্তরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বক্তব্যের প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার বক্তব্যকে সেনা দপ্তর কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

উল্লেখ্য, গত ১৭ এপ্রিল ২০০৪ প্রকাশিত 'পাহাড়ে সেনা সন্ত্রাসের কারণে জুম্ম জনগণ উৎসব পালন করতে পারছে না নিরাপদে' শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে সন্তু লারমাকে উদ্দেশ্য করে সেনা সদর দপ্তরের বক্তব্যে'র বরাত দিয়ে দৈনিক পূর্বকোণে ২১ এপ্রিল ২০০৪ 'সন্তু লারমার বক্তব্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঃ সেনা দপ্তর' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা সন্ত্রাসের বিষয়ে সন্তু লারমার যে বক্তব্য ও ব্যাখ্যা তা সম্পূর্ণ বস্তুগত ও বাস্তবসম্মত। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিকভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান এবং এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। যে চুক্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, ভিডিপি, এপিবিএন ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের ৬ বছরের অধিক সময়ে মাত্র ৩২ টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা জানা গেলেও এখনও এধরনের ৫ শতাধিক সেনাক্যাম্প অপ্রত্যাহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। উপরন্তু অপারেশন দাবানলের পরিবর্তে অপারেশন উত্তরনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও সেনা শাসন অব্যাহত রয়েছে। যে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে এখনও সেনা কর্তৃত্ব রয়ে গেছে এবং যে কারণে এখনও জুম্ম জনগণ প্রতিনিয়ত সেনা নির্যাতন, হুমকী, হামলা, অভিযান, খবরদারীর শিকারে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে এই সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ মহল চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সন্ত্রাসী রাজত্ব অব্যাহত রেখে চলেছে।

ফলে এই পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের শুধু উৎসব পালন নয়, স্বাভাবিক জীবনযাপনও প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ও নিরাপদ হতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে সন্তু লারমার বক্তব্য নয়, প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার নামে অপারেশন উত্তরন নামক সেনা শাসন ও সেনা সন্ত্রাস যা চুক্তি ও মানবতা পরিপন্থী তা আড়াল করার অপচেষ্টা বিধায় সেনা সদর দপ্তরের বক্তব্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বিবেচনা করা যায়।

পত্রিকায় আরো উল্লেখ করা হয়, 'সেনা সদর দপ্তর জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর টহল পরিচালনা একটি নিয়মিত রুটিন কার্যক্রম। তবুও খাগড়াছড়ি গুইমারার আলুটিলা বা তৎসংলগ্ন এলাকায় বৈসাবি উৎসব চলাকালীন সময়ে কোন ধরনের টহল বা অভিযান পরিচালিত হয়নি।' এতে আরো বলা হয়, 'সেনা বাহিনী কর্তৃক হামলা চালিয়ে উপজাতীয় উৎসব ভন্ডুল করার অভিযোগ মোটেও সত্য নয়'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রেও সেনা সদর দপ্তরের বক্তব্য সত্য নয়। কেননা একটি ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু ও বিষুর সময়ে উক্ত আলুটিলা এলাকায় স্থানীয় সেনা সদস্যরা অহেতুক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেনা অভিযান চালিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের নির্যাতন নিপীড়ন চালায়।

গত ১ এপ্রিল ২০০৪ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের আলুটিলা এলাকার হৃদয় মেম্বার পাড়ায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটলে গ্রামবাসী তিন জন ডাকাতকে ধরে স্থানীয় ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের হাতে সোপর্দ করে। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই সেনা সদস্যরা আশ্চর্যজনকভাবে গ্রামবাসীদেরকে নানাভাবে হয়রানী করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে ১০ এপ্রিল ২০০৪ খাগড়াছড়ি সদরের চন্দ্রপাড়া ক্যাম্পের লে. আশরাফ এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য সামরিক অভিযান চালিয়ে আলুটিলার হৃদয় মেম্বারপাড়া এলাকার চন্দ্র মোহন ত্রিপুরা (২৫), বাবুল জ্যোতি ত্রিপুরা (৩০) ও শ্যামল জ্যোতি ত্রিপুরা (৩২) নামে তিন নিরীহ গ্রামরাসীকে গ্রেফতার করে এবং পরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। এই ডাকাতি ঘটনার অজুহাতে ১২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখেও বিকাল ৫ টায় সেনা সদস্যরা উক্ত গ্রামে সেনা অভিযান চালায়। এতে সুনীল ত্রিপুরা (১৬), কালয় চান ত্রিপুরা (১৭) ও উন্নয়ন বোর্ডের বাগান রক্ষী দয়াল চাকমাকে মধ্যরাত পর্যন্ত আটকে রেখে নৃশংসভাবে নির্যাতন চালানো হয়। সর্বশেষ ১৩ এপ্রিল ২০০৪ বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু ও বিষু উৎসবের প্রথম দিনেও সেনা সদস্যরা আবার অপারেশন চালায়। এতে সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীর অনেককে নানাভাবে হয়রানী করে। এমনকি তাদেরকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হুমকীও প্রদান করা হয়। ফলে তাদের নিরাপদে ও যথাযথভাবে উৎসব পালন ব্যাহত হয়।

৮ ও ৯ মে তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতির সর্বাত্মক হরতাল পালিত

গত ৮ মে ২০০৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং তদস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করার বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। উল্লেখ্য যে, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী তিন পার্বত্য জেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালন করার পর এসএসসি পরীক্ষা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু ও বিষু উপলক্ষ্যে স্থগিত রাখা হয়।

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আহুত এই হরতাল কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালনকালে বান্দরবান জেলা সদরে একটি চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মী এবং নিরীহ পাহাড়ীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। এই সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্বদানকারী ও উস্কানীদাতাদের মধ্যে যাদেরকে চিহ্নিত করা হয় তারা হল- (১) হাফেজ মোঃ আজিজুল হক, চারদলীয় ঐক্যজোট তথা স্থানীয় জামাত নেতা ও ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদপ্রার্থী, (২) মনির হোসেন, সম অধিকার আন্দোলনের নেতা, (৩) আবদুল মাবুদ, যুবদলের জেলা সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক, (৪) মোহাম্মদ ইলিয়াছ, গণপরিষদ নেতা ওসমান গণির ছোট ভাই, (৫) মোঃ মোস্তফা, (৬) নূরে আলম, (৭) কামাল হাশেম ও তার পিতা (৮) আহমদ হাশেম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সেদিন দুপুর প্রায় ১২ টায় বান্দরবান জেলা সদরস্থ কে এস প্রু মার্কেটের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং এর সময় উক্ত সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে লাঠিসোটা ও কিরিচসহ জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের উপর এই ন্যাক্কারজনক হামলা শুরু করে। সাথে সাথে তারা প্রেসক্লাবের সামনে ও কোর্ট বিল্ডিং এলাকায়ও পাহাড়ীদের উপর চড়াও হয়। এসময় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি থানা যুব সমিতির সদস্য সচিব নিরলাল তঞ্চঙ্গ্যা (২৪) পীং- বিমল তঞ্চঙ্গ্যা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদর থানা সদস্য উচ্ছ্রা মারমা (২২) পীং অংইয়ো মং মারমা হামলাকারীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন। এসময় হামলাকারীরা অগ্রণী ব্যাংকসহ পাহাড়ীদের বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙচুর করে। এর পরপরই হামলাকারীরা পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় ছাত্রাবাসেও হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাট চালায়। এতে বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র উথোয়াই চিং মারমা (১৬) পীং মংক্যঅং মারমা, ডনবসকো উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র নিংথোয়াই অং মারমা (১৬) পীং মংহ্লাপ্রু মারমা ও একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র জোসেফ ত্রিপুরা (১৬) পীং পদ্মমনি ত্রিপুরা নামে

তিন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের সবাইকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ উক্ত চার দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবীতে পূর্ব ঘোষিত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক হরতাল কর্মসূচীতে বান্দরবানে উক্ত হামলাকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানানো হয় এবং উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তারপর দিন ৯ মে ২০০৪ তিন পার্বত্য জেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, হরতাল কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে বিকাল ৫ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙামাটি জেলা সদরের রাজবাড়ীস্থ শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমা। বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় রাজনীতি বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ইউসুফ আলম, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চৈতালী ত্রিপুরা।

সভায় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও শান্তি এবং এই এলাকার সমৃদ্ধির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নসহ উক্ত চার দফা দাবীনামা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ৫ এপ্রিল ২০০৪ রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী হলে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভানেত্রী সুপ্রভা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী মাধবী লতা চাকমা, জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, যুব সমিতির পরিচালক ধীর কুমার চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি আসীন চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জোনাকী চাকমা। সম্মেলনে সুপ্রভা চাকমাকে সভানেত্রী ও চঞ্চলা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদিকা করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১২তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

২০ মে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর দুদিন ধরে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ১২ তম কেন্দ্রয়ি কাউন্সিল অনুষ্টিত হয়। বান্দরবান জেলার রাজবাড়ী মাঠে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির রাজনীতি ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর একটি বিশাল র‍্যালী নন্দরবান শহর প্রদক্ষিণ করে পৌর মিলনায়তনে এসে সমাপ্ত হয়। ১২তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এই পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের অপরাপর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উজ্জ্বল চাকমাকে সভাপতি ও বিনোতাময় ধামাইকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত কওে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উজ্জ্বল চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সরকার কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে চুক্তি লঙ্ঘনের দিকগুলো তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রতিনিধিরা আরও বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ ও চুক্তি বাতিল দাবীকারী বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমঅধিকার আন্দোলন মিলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বকে চিরতওে বিলুপ্ত করতে জোটবদ্ধ হয়েছে। জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেও চেয়ারম্যান পদে সেটেলার নেতা, সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেনাক্যাম্প্র প্রত্যাহারের বিপরীতে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলাররা গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও ভূমি বেদখল করে চলেছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নোক্ত কতকগুলি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

১) ভূমি বেদখল, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও বেআইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করা;
২) চুক্তিবিরোধীদের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে জনমত সুদৃঢ় করা;
৩) সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবীতে আন্দোলন জোরদার করা;

৪) মানবাধিকার লংঘন ও ননারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা;
৫) শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করা ও প্রাথমকি স্তওে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালুসহ উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ী শিক্ষা কোটা বৃদ্ধি করার দাবী জোরদার করা প্রভৃতি।

কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ দিবস পালন

১২ জুন ২০০৪ রাঙামাটি ও বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। রাঙামাটিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায়ণ সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চৈতালী ত্রিপুরা, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য উনুপ্রু, জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা, পিসিপির সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, রাঙামাটি জেলা জনসংহতি সমিতির সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, পিসিপি রাঙামাটি জেলার সভাপতি আসীন চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্রভা চাকমা এবং প্রতিবাদ সভা পরিচালনা করেন মেঞোচিং মারমা। বক্তাগণ বলেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কুখ্যাত লে. ফেরদৌস ও তার দোসররা কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করলেও সরকার এখনো তার কোন হদিস দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়নি। বরং বর্তমানেও কল্পনা চাকমার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হতে না পপারার কারনে নারীদের নিরাপত্তা প্রতিদিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে বাঘাইছড়িতে নিউলাল্যাঘোনা উগোলছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফুলরানী চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন জেএসএস এর সাগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, মহিলা সমিতির সভাপতি মাধবীলতা চাকমা, সহসভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমা, জেএসএস কেন্দ্রীয় সদস্য প্রভাত কুমার চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য মিলন ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি থানার জেএসএস সভাপতি সুভাষবসু চাকমা। প্রতিবাদ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনিতা চাকমা এবং সভা পরিচালনা করেন সাগরিকা চাকমা। বক্তাগণ বলেন যে, বাঘাইছড়ি তথা পার্বত্য নারী সমাজের অহংকার কল্পনা চাকমা নারীসমাজের অধিকার তথা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এক বীরোচিত নাম। তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদী, প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক। তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবার জন্যে লে. ফেরদৌস, ভিডিপি সদস্য নুরুল হকসহ নরপশুরা গভীর রাতে তাকে নিজ বাড়ী লাল্যঘোনা হতে অপহরণ করেছিল। সেদিন তারা তার ভাইকেও গুলী করে হত্যা করতে চেয়েছিলো। সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে বরং ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেবার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তারা অবিলম্বে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও লে. ফেরদৌসসহ সকল দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসি দাবী করেন।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ৯ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর দু'দিনব্যাপী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলার ৯ম শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। "সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করুন" - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত ৯ম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্টানে উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনসংহতি সমিতির রাজনীতি ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সহ আইন ও ভূমি বিষয়ক সহ-সম্পাদক শক্তিমান চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য কেএসমং মারমা, তথ্য ও প্রচার বিভাগের সহকারী সম্পাদক তনয় দেওয়ান, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা, জেলার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক মৃগাঙ্ক খীসা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র শাখার সভাপতি আসীন চাকমা।

পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আসীন চাকমা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনসংহতি সমিতির ছাত্র ও রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার। অন্যান্যের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কে এস মং মারমা, সহকারী ভূমি ও আইন বিষয়ক সম্পাদক শক্তিমান চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি, ছাত্র সংগঠন প্রসঙ্গে এবং নেতৃত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন শাখা সংগঠন থেকে শত শত ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। সম্মেলনে আসীন চাকমাকে সভাপতি, যুবন বিকাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, ফরেন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং শোভন চাকমাকে অর্থ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত জেলা কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাই।

চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ'র অব্যাহত তান্ডবতা

ইউডিপিএফ কর্তৃক বন্দুকভাঙ্গায় ২ জনকে গুলি করে খুন ও ৮ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

৬ মার্চ ২০০৪ দিবাগত রাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি সদর থানাধীন বন্দুকভাঙ্গা এলাকায় হামলা চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ২ (দুই) ব্যক্তিকে হত্যা, ৮ (আট) জনকে অপহরণ ও একটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। নানিয়ারচর বন্দুকভাঙ্গা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত ইউপিডিএফের সদস্য শান্তিদেব চাকমা (৩০) ও তপন জ্যোতি চাকামা (৩২) এর নেতৃত্বে এই জঘন্য সন্ত্রাসী ঘটনাটি সংঘটিত হয় বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, এদিন রাত প্রায় ১১.০০ টায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বন্দুকভাঙ্গা মৌজার কড়ল্যামুড়া গ্রাম ও পলাদ আদামের ১০ ব্যক্তিকে আটক করে পার্শ্ববর্তী সাহসবান্দা ঘাটে নিয়ে যায়। এরপর রাত প্রায় ১.৩০ টায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আটতকৃতদের মধ্য হতে জনসংহতি সমিতির সদস্য চিত্র কুমার চাকমা (২৭), পীং কমলা কান্ত চাকমা, গ্রাম পলাদ আদাম এবং যুদ্ধধন চাকমা ওরফে কেত্তুয়া (২৮) পীং মৃত মনি চাকমা, গ্রাম পলাদ আদাম নামে ২ (দুই) ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে এবং নিম্নোক্ত ৮ (আট) ব্যক্তিকে অপহরণ করে মাছ্যাছড়া ও ত্রিপুরাছড়া হয়ে পালিয়ে যায় ঃ

১। হামেশ কুমার কার্বারী (৫০) পীং মৃত বিশ্বকর্মা কার্বারী, গ্রাম কড়ল্যামুড়া;
২। বিরাজ মণি চাকমা (৩৫) পীং সূর্যসেন চাকমা, গ্রাম কড়ল্যামুড়া;
৩। কান্তি চাকমা (২৫) পীং শান্তি কুমার চাকমা, গ্রাম কড়ল্যামুড়া;
৪। প্রভাত চাকমা (৫২) পীং মৃত বাত্যা চাকমা, গ্রাম সাহসবান্দা;
৫। সাধন মণি চাকমা (৪২), পীং সূর্যসেন চাকমা, গ্রাম কড়ল্যামুড়া;
৬। সুমতি রঞ্জন চাকমা (৩৩) পীং পাত্তর্য্যা চাকমা, গ্রাম কড়ল্যামুড়া;
৭। কংস চাকমা (৫৫) পীং মণি চাকমা, গ্রাম পলাদ আদাম;
৮। কান্তি চাকমা (২৬) পীং অজ্ঞাত, গ্রাম পানছড়ি, শুভলং ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা

উল্লেখ্য, অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় সন্ত্রাসীরা পলাদ আদামের শান্তি রঞ্জন চাকমা (৪৫) এর বাড়ীও অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

নানিয়ারচরে বিপুল চাকমা দর্শনের বাড়ীতে ইউপিডিএফ'র গুলীবর্ষণ

১০ এপ্রিল ২০০৪ ইউপিডিএফ'র একদল সশস্ত্র সদস্য দু'জন দুষ্কৃতিকারী ১) প্রতুল সেন চাকমা, পিতা- চিক্যা চাকমা, উত্তর ফিরিঙ্গিপাড়া ও ২) বিপ্লব চাকমা, পিতা- শান্তিলাল চাকমা, মহাজন পাড়া এর সহায়তায় নানিয়রচর বাজারে দূর্গামনি চাকমার বাড়ীতে হামলা চালায়। তারা পিসিপির অমরসিং চাকমা ও সুমন্ত চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলী চালায়। তাদের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও বিপুল চাকমা দর্শন হাতে গুলীবিদ্ধ হন। তাকে পরে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক সুভলং-এ ৪ জন নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গতকাল ৭ মে ২০০৪ রাত প্রায় ১১.০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ এর ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র দল কর্তৃক রাঙামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের দীঘলছড়ি এলাকা হতে বনবিহারী চাকমা (৩৫) পীং মৃত খগেন্দ্র চাকমা, অনিল কুমার চাকমা (২৬) (শিক্ষক, পানছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়) পীং- চিত্ত রঞ্জন চাকমা, সাধন চন্দ্র চাকমা (৪৫) পীং- হরিশ্চন্দ্র চাকমা ও রঞ্জন চাকমা (৩৫) পীং- আনন্দ চাকমা প্রমুখ ৪ (চার) নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে।

উল্লেখ্য, অপহরণকারী সন্ত্রাসীরা উক্ত চার নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের পরিবারের কাছে একেক জনের মুক্তিপণ হিসেবে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ৪ লক্ষ টাকা দাবী করে। এ ব্যাপারে অনিল কুমার চাকমার জন্য কুতুকছড়ি বাজার এলাকায় এবং অপর তিন জনের জন্য নানিয়ারচর বাজার এলাকায় অতি দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য বলে গেছে। অতি দ্রুত যোগাযোগ পূর্বক দাবীকৃত মুক্তিপণ দেয়া না হলে অবিলম্বে অপহৃতদের হত্যা করা হবে বলেও সন্ত্রাসীরা হুমকী দিয়ে গেছে। জানা গেছে, চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীদের এই দলে নেতৃত্ব দিয়েছে সচিব চাকমা ও আনন্দ প্রকাশ চাকমা। জানা গেছে, বনবিহারী চাকমা, সাধন চন্দ্র চাকমা ও রঞ্জন চাকমা চুক্তির সাধারণ সমর্থক হলেও শিক্ষক অনিল কুমার চাকমা এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

নানিয়ারচর বাজারে চুক্তি সমর্থকদের উপর ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের হামলা

গত ৭ মে ২০০৪ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী নানিয়ারচর বাজারে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থক ছাত্র-যুবকদের উপর হামলা করে। এতে চুক্তি সমর্থক ছাত্র-যুবকরা প্রতিরোধ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে অমৃত চাকমা, মুকুল চাকমা পিতা সুজন চাকমা ও দেব রঞ্জন চাকমা পিতা ইন্দু বিকাশ চাকমা নামে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের ধরে ছাত্র-যুবকরা নানিয়ারচর থানায় সোপর্দ করে। কিন্তু সোপর্দ করার কিছুক্ষণ পর পুলিশ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেয়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির নানিয়ারচর থানার আহ্বায়কের বাড়ীতে গুলিবর্ষণ

গত ১৭ মে ২০০৪ মধ্য রাতে ইউপিডিএফ'র একটি সশস্ত্র দল দিপেন্দু চাকমার নেতৃত্বে জনসয়ংহতি সমিতির নানিয়ারচর শাখার আহ্বায়ক জ্ঞানরঞ্জন চাকসার বাড়ীতে সশস্ত্র হামলা চালায়। জানা যায় যে, এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পঞ্চানন চাকমার ইঙ্গিতে ইপিডিএফ'র সন্ত্রাসীরা হামলাটি চালিয়েছিল।

ইউপিডিএফ কর্তৃক কাউখালীতে ৬ পরিবারকে তাড়িয়ে দিয়েছে

গত ২৩ মে ২০০৪ ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র ক্যাডাররা কাউখালীর বেতছড়ি ও মিটিঙ্গ্যাছড়ি গ্রামের ৬ পরিবারকে গ্রামছাড়া করেছে। উচ্ছেদকৃত পরিবারের সদস্যরা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের আত্মীয় হওয়ায় তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদদের শিকার পরিবারগুলো হলো হরিচন্দ্র চাকমা (৪৮) পীং মৃত মহেন্দ্র লাল চাকমা, প্রফুল্ল চাকমা (৪৫) পীং মৃত মহেন্দ্র লাল চাকমা, সুদীপ্ত চাকমা (৩৫) পীং মৃত মহেন্দ্র লাল চাকমা, প্রদীপ কুমার চাকমা (৫০) পীং লব কুমার চাকমা, চন্দ্র কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫) ও সাধন বিকাশ চাকমা।

ঘাগড়ার চেলছড়া থেকে নিরীহ গ্রামবাসীকে উচ্ছেদ

গত ২৫ মে ২০০৪ মিলন কান্তি চাকমা ওরফে সুগত-এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদর সন্ত্রাসী কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া মৌজার চেলছড়া গ্রামের অধিবাসী বিমল চন্দ্র চাকমা (৪৬) পিতা মৃত কুমুজ্যা কার্বারীকে কোন অপরাধ ছাড়াই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিমল চাকমার একজোড়া হালের গরুও ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা জব্দ করে।

কাউখালীতে গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে দিয়েছে ইউপিডিএফ

৩০ মে ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টার দিকে কাউখালী হতে বিধু চাকমা, ২৬, পীং কবিরন চাকমা, ডোবাকাটা, ৯৬নং ফটিকছড়ি মৌজা, কাউখালী থানা ও অমর চাকমা ভাস্কর (বিজিগুলো), ৩৫, পীং- অজ্ঞাত, সাং- বন্দুকভাঙ্গা মৌজা এর নেতৃত্বে প্রায় ১০জন সশস্ত্র ইউপিডিএফ কর্মী বড়ইতলী, ১৪নং নানুপুর ইউনিয়ন, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম জেলা এর নিবাসী সঞ্চয়মনি চাকমা, ৭০, পীং- মৃত বুদ্ধধন চাকমা এর বাড়ী ঘেরাও করে এবং বাড়ী হতে পরিবারের সকল সদস্যদেরকে তাড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হলে ঘটনার ২দিন পরে গ্রামবাসীরা ইউপিডিএফ এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং গ্রামবাসীরা সকল প্রকার দায়দায়িত্ব বহন করে উক্ত সঞ্চয়মনি চাকমার পরিবারকে আবার নিজবাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে।

দীর্ঘদিন সেখানে কোন ঝামেলা না থাকা সত্বেও ২৭ জুন তারিখে আবার ইউপিডএফ এর ৮জন সশস্ত্র সদস্যরা বেলা ১টায় সঞ্চয়মনি চাকমার বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সঞ্চয়মনি চাকমার ছেলে রবিভূষণ চাকমা, ৩২ এর কাছ থেকে নগদ ৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। তাছাড়া মিসেস গুল্যার স্ত্রীর কাছ থেকে আনুমানিক নগদ ২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরিবারের সদস্যরা এক কাপড়ে বাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা কোনরকম কাপড়চোপড় নিয়ে আসারও সুযোগ দেয়নি। বাড়ীর অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র কুড়াল দিয়ে তছনছ ও ভাঙচুর করে। এছাড়া গরু-ছাগল ও মুরগী জোরপূর্বক নিয়ে যায়। এসকল সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষাধিক টাকা। বর্তমানে সঞ্চয়মনি চাকমার পরিবার উদ্ভ্রান্ত হয়ে অসহায়ভাবে রাঙামাটিতে নি:স্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এছাড়া বেলা ২টার দিকে উক্ত সন্ত্রাসীরা (১) বিপুল চাকমা নিতাই লাম্বায়ে, ৪০, (২) অমলেন্দু চাকমা (সাবেক ইউপি মেম্বার, ৩২, পীং-সুরন্ত কুমার চাকমা, সাং- মিটিঙ্গ্যাছড়ি, ৩নং ঘাগড়া ইউপি, কাউখালী উপজেলা (৩) বিদ্যুৎ চাকমা, ৫০, পীং- অজ্ঞাত, সাং- অজ্ঞাত এর নেতৃত্বে নিম্নের ব্যক্তির ঘর ঘেরাও করে। তাকে তারা বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেয়। তার ১ জোড়া গরুও ছিনিয়ে নেয়া হয়। তার মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষাধিক টাকা। ভিক্টিমের নাম: সূর্যবান চাকমা, ৩০, পীং- মৃত কামিনী মোহন চাকমা, সাং- ডলুপাড়া, ২ নং ফটিকছড়ি ইউনিয়ন, কাউখালী থানা।

সাপমারায় ইউপিডিএফ কর্তৃক একজন অপহৃত ও খুন

গত ৩ জুন ২০০৪ সকাল ১০:৩০ টায় নানিয়ারচর সদর উপজেলাধীন সাপমারা গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে সুজিত চাকমা (নিগিরা কান্তি), ২২, পীং চন্দ্র কুমার চাকমাকে চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী ইউপিডিফের সশস্ত্র সদস্যরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পরও

তাকে ছেড়ে না দিলে অনেক চেষ্টার পর ইউপিডিএফ এর সদস্যদের সাথে অপহৃতের পক্ষ থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। এতে তারা বলে যে, তাদের নিকট অপহৃতকে আনা হয়নি। সম্প্রতি জানা গেছে যে, সন্ত্রাসীরা অপহৃত সুজিত চাকমাকে হত্যা করেছে।

কলাবুনিয়ায় ইউপিডিএফ'র হামলা

৪ জুন ২০০৪ মিলন চাকমা সুগত, ৩০, পীং- নলিন্দ বিকাশ চাকমা, সাং- খারাঙ্গ্যা, ৯৮ নং কচুখালী মৌজা, ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়ন, থানা কাউখালী ও বিধু চাকমার নেতৃত্বে ২৫ জনের ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল (যেখানে কতিপয় সাঁওতালও রয়েছে যাদেরকে ফটিকছড়ি চা বাগান থেকে ইউপিডিএফ- এ ভর্তি করা হয়েছে) দুপুর ১২টার দিকে কাউখালী থানার ৯৪নং ন' ভাঙ্গা মৌজায় কলাবুনিয়া গ্রামে হামলা চালায়। তারা এসময় শশী ভূষণ চাকমা (৩৫) পীং- মৃত সুরজয় চাকমাকে মারধর করে এবং ইন্দ্রমুখী চাকমা (৫০) স্বামী- মৃত সুরজয় চাকমাকে কুড়াল দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করে। এছাড়া দেবব্রত চাকমা (৩৭) পীং- মৃত সুরজয় চাকমা, শশী ভূষণ চাকমা ও সুনীলময় চাকমা (৩০) পীং- রঞ্জনমনি চাকমার বাড়ী সম্পূর্ণরূপে তছনছ করে দেয়।

এছাড়া ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা শুকনো হলুদ ২০ মণ, গরু ৩টি, শুকর ৩টি, মুরগী ১০০টি (আনুমানিক), ধানের মেশিন ১টি, ধান ৭০ আড়ি ইত্যাদি মিলে প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুটপাট করে। বর্তমানে এসকল উদ্ভাস্তু পরিবার ভেদভেদী, রাঙামাটিতে অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য খুন

গত ২৭ জুলাই ২০০৪ ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যদের গুলীতে একজন জনসংহতি সমিতির সদস্য খুন হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের এইটমরার বান্দরীটিলা নামক স্থানে। খুন হওয়া জনসংহতি সমিতির সদস্যটির নাম নয়ন চাকমা।

নানুপুর থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবী

গত ২০ আগষ্ট ২০০৪ অনুক্কো চাকমা, মিলন চাকমা ও রাজু মারমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সদস্য কাউখালী উপজেলা সংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নানুপুর এলাকার কিল্লার বাক থেকে বড় মরত্তো চাকমা (৫০) পিতা নতুন সেন চাকমা ও বাদীনলা চাকমা (৩০) পিতা সূয্যসেন চাকমা নামে দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। পরে অপহরণকারীদের সাথে অপহৃতদের আত্মীয়রা যোগাযোগ করলে ২ (দুই) লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবী করে।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ২ জন অপহৃত

গত ২৭ আগষ্ট ২০০৪ রাত প্রায় ৮:৩০ টায় ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী সদস্যরা মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বাল্যাছড়ি গ্রাম হতে দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহৃতরা হল- (১) সুমন ত্রিপুরা (১৮) পীং- কেশরায় ত্রিপুরা ও (২) ফের মোহন ত্রিপুরা (২৫) পীং- হিরণজয় ত্রিপুরা।

বর্মাছড়িতে ইউপিডিএফের সশস্ত্র গণহামলায় ৮৮ পরিবার উদ্বাস্তু

গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দু'দিনব্যাপী চুক্তি বিরোধীরা কাউখালী উপজেলার বর্মাছড়িতে হামলা চালিয়ে ৮৮ পরিবারকে উচ্ছেদ করে গ্রামছাড়া করেছে। এসকল উদ্বাস্তু পডিবার এখন রাঙ্গামাটি শহরে, ঘাগড়া কমিউনিটি সেন্টারে ও এর আশেপাশে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ভুক্তভোগীরা জানায় যে, ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করলে তারা তা প্রদান করতে অসমর্থ হওয়ায় তাদেরকে জোর করে গণহারে মারধর করার পর উচ্ছেদ করেছে। উচ্ছেদকৃত গ্রামগুলো হলো ডুলু পাড়া, বড়ইতলী, কলাবন্যা, ফিত্তিপাড়া, মানেকছড়ি, তোন খেইয়্যা, গলাছড়ি, দোবাকাটা, মিদিঙ্যাছড়ি, বেতছড়ি, ছোট ডুলু ও বড় ডুলু। এসকল উদ্বাস্তু পরিবার এখনও আতঙ্কে ভূগছেন।

বর্মাছড়িতে ইউপিডিএফ'র বর্বরতা

গত ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কয়েকটি এলাকায় চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা হামলা চালিয়ে নারী ও বৃদ্ধসহ ১০ জনকে মারাত্মকভাবে মারধর করেছে এবং ৮ টি বাড়ীতে লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। সন্ত্রাসীদের কর্তৃক প্রহৃত ব্যক্তিরা হলো বীরেন্দ্র চাকমা (৮২) পীং- মৃত নব কুমার চাকমা, মিসেস ইত্তুকী চাকমা (৭৫) স্বামী- বীরেন্দ্র চাকমা, মিসেস মৃগবানু চাকমা (৩২) স্বামী- পুলিন চাকমা, মিসেস জিয়নবালা চাকমা (৪০) (প্রতিবন্ধী) স্বামী- রামকৃষ্ণ চাকমা, বিউটি চাকমা (২১) পীং- পূর্ণমাঝি চাকমা, যুদ্ধমনি কার্বারী (৭৫) পীং- নীলচন্দ্র চাকমা,

যুদ্ধমালা চাকমা (৩২) স্বামী- সুরেশ কুমার চাকমা, সিংহমনি চাকমা (৩৫) পীং- মৃত বীরসেন চাকমা, কমলাকান্ত চাকমা (৫০) সাং- ত্রিপুরাছড়ি, উত্তরা কান্ত চাকমা (৫৫) বর্মাছড়ি ইউনিয়ন, লক্ষীছড়ি থানা।

অপরদিকে যাদের বাড়ী লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে তারা হলো কালঞ্জয় চাকমা (৪৫) পীং- ধীরেন্দ্র লাল চাকমা, রঞ্জু চাকমা (১৮) পীং- সতীশ চন্দ্র চাকমা, জ্যোতিময় চাকমা (৩১) পীং- কিরিশ চন্দ্র চাকমা, মিগিতা রানী চাকমা (৪৮) স্বামী- কালাচান মাস্টার, বিভূতি চাকমা (৩৫) পীং- নিরঞ্জয় মুনি চাকমা, কমল কিষ্ট চাকমা (৪০) পীং- শাক্যন্যে চাকমা, বিধু ভূষণ চাকমা (৩০) পীং- ধীরেন্দ্র লাল চাকমা এবং মংগু বিকাশ চাকমা (৩৮) পীং- ধীরেন্দ্র লাল চাকমা।

জানা গেছে, এই সন্ত্রাসী ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে রবিচন্দ্র চাকমা (৩০) পীং- রশি কুমার চাকমা, সাং- শুকনাছড়ি, ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়ন, কাউখালী; মিলন চাকমা (৩২) পীং- নলিন্দ বিকাশ চাকমা, সাং- হারাঙ্গিপাড়া, ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়ন, কাউখালী; এবং অমর মানিক চাকমা ভাস্কর (৩৫) পীং- সাং- তিবিরাছড়া, বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন, রাঙামাটি সদর।

শিজকে ইউপিডিএফ কর্তৃক ব্যবসায়ী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ নীল বরণ চাকমার নেতৃত্বের একদল ইউডিপিএফ সশস্ত্র সদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজক মোরঘোনা থেকে গুণবান চাকমা (৩২) পিতা সুরেশ কুমার চাকমা, বীরবাহু চাকমা (৪০) পিতা মৃত চিত্ত রঞ্জন চাকমা, স্নেহ কুমার চাকমা (৩৮) পিতা মনোরঞ্জন চাকমা, ধন্ত বিকাশ চাকমা (৩২) পিতা হেম রঞ্জন চাকমা ও পুষ্প বিকাশ চাকমা (৩৫) পিতা হেম রঞ্জন চাকমা প্রমুখ ব্যবসায়ীদেরকে অপহরণ করে। তম্মধ্যে পুষ্প বিকাশ চাকমা সন্ত্রাসী কবল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট ৪ জনের মধ্যে গুণবান চাকমাকে রেখে বাকী ৩ জনকে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে আসার জন্য দুরছড়ি বাজারে সওদাগরদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, ইউডিপিএফ সন্ত্রাসীরা উক্ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। পরবর্তীতে নগদ ৮০ হাজার আদায় পূর্বক এবং অবশিষ্ট টাকা পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে মর্মে মুচেলিকা নিয়ে গুণবান চাকমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার সময় তপন চাকমা নামে বারিবিন্দু ঘাটের জনৈক দোকানদার থেকে ৬০ হাজার টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ইউপিডিএফের এই সশস্ত্র দলটি পরবর্তীতে ১৭ সেপ্টেম্বর গঙ্গারামের উল্টাছড়ি থেকে রুণেল চাকমা (২৭) পিতা হেমন্ত চাকমা জনৈক কাট্টলীর অধিবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং রুনেলের বিষয়ে দীঘিনালার বাবুছড়া এলাকায় যোগাযোগ করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের নির্দেশ দিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক বাঘাইছড়ি লাঙ্গলমারায় ৩জন গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সিজ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একটি সশস্ত্র দল বাঘাইছড়ি উপজেলার লাঙ্গলমারা গ্রামের হামলা চালিয়ে নির্মল চাকমা (২৮), সুরেন্দ্র চাকমা (৬০) ও পদলা চাকমা (৩৫) নামে তিনজন গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। চলে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়ে যায় যে, ২ ঘন্টার মধ্যে আড়াই কুইন্টাল চাল, ২০ কেটি ওজনের একটি ছাগল এবং ২০ কেজি মুরগী নিদিষ্ট স্থানে পৌছে দিতে ব্যর্থ হলে অপহৃতদের হত্যা করা হবে। কিন্তু হতদরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে তাৎক্ষণিক ততটুকু চাল ও মাংস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সর্বসার্কুল্যে ৪১ কেজি চাল, ১৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ও ৫টি মুরগী সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে পৌছে দেয় এবং হাতে পায়ে মাফ চাইলে তবেই নিরীহ তিন গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ২ জন গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৭ অক্টোবর ২০০৪ রোজ বুধবার রাত প্রায় ৮.৩০ ঘটিকায় ইউপিডিএফ'র সশস্ত্র সদস্যরা মাটিরাঙ্গা উপজেলার বাল্যছড়ি গ্রাম হতে দু'জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপহৃতরা হলেন-

১) সুমন ত্রিপুরা, ১৮, পিতা- কেশরায় ত্রিপুরা
২) ফেরমোহন ত্রিপুরা, ২৫, পিতা- হিরনজয় ত্রিপুরা

অপরদিকে সুমন ত্রিপুরার বড় ভাই লতাই ত্রিপুরাকে মাটিরাঙ্গা ও বাল্যাছড়ি থেকে আসা সেনা সদস্যরা গত ২৯ অক্টোবর তারিখের রাতে বেঢম পিঠিয়েছে। অপহৃতদের এখনো কোন হদিস মিলেনি।

থাইল্যান্ডে চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি শীর্ষক প্রাথমিক সংলাপ

গত ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০০৪ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ট্রাইবেল সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক ফর পিস ইন সিএইচটি, এশিয়ান ইন্ডিজেনাস পিপলস সেন্টার ফর রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং এশিয়ান রিসোর্স ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রাথমিক সংলাপ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার এবং ভূমি ও আইন বিষয়ক সহকারী সম্পাদক এডভোকেট শক্তিমান চাকমা যোগদান করেন। চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফলতা ও বিফলতা, চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক এনজিও নেটওয়ার্ক, ইন্টারফেইথ মুভমেন্ট ও আদিবাসী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে "মাল্টি-এথনিক এশিয়া ফোরাম ফর পিস, কো-অপারেশন এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক দু'টো কর্মশালা ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিগত ২০০২ সালে চীনে এবং থামাসাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ২০০৩ সালের থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাগুলোর ফলো-আপ কর্মসূচী হিসেবে "পার্বত্য চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রাথমিক সংলাপ" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার কর্তৃক চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি, অস্থায়ী সেনাক্যাম্প ও সেনাশাসন প্রত্যাহারের পরিবর্তে নতুন সেনাক্যাম্প স্থাপন ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে নতুন সেনাশাসন জারী, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা সৃষ্টি ও জুম্মদের ভূমি বেদখল ইত্যাদি বিষয়সমূহ তুলে ধরেন এবং চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। কর্মশালার শেষপ্রান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।

ফিলিপাইনে এশীয় আদিবাসী নারী সম্মেলন

গত ৪-৮ মার্চ ২০০৪ ফিলিপাইনের বাগিও সিটিতে অনুষ্ঠিত এশীয় আদিবাসী নারী সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি শ্রীমতি আরতি চাকমা যোগদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে এইচটিএনএফের পক্ষে ফোরামের প্রশাসনিক সহকারী নাইউ প্রু মারমা মেরী, এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষে পবিত্র মান্দা যোগদান করেন। উলেখ্য, বাংলাদেশ, বার্মা, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ ১৩টি দেশের ১০০ জন নারী নেত্রী উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

বাংলাদেশের নারী প্রতিনিধিরা আদিবাসী নারীদের উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ-বঞ্চনার পাশাপাশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও সামরিক সন্ত্রাসের চিত্র তুলে ধরেন। অন্যান্য সমাজের ন্যায় বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজেও এখনো নারীদের স্থান নিম্নস্তরে। ভোগ্যপণ্য, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও সেবাদাস হিসেবে সমাজে বিবেচনা করা হয়। তাদের সারা জীবন শয়ন ঘর, আতুর ঘর ও রান্না ঘরেই গন্ডীবদ্ধ থাকতে হয়। পক্ষান্তরে জাতিগত নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক হামলার অন্যতম শিকার হচ্ছে আদিবাসী নারীরা। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজের উপর ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসের চিত্র তুলে ধরেন। নারীরা পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণ শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হন বলে তারা সম্মেলনে তুলে ধরেন। তারা একাধারে আদিবাসী হিসেবে সাম্প্রদায়িতকা ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার আর নারী হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বঞ্চনার শিকার বলে জানান। উল্লেখ্য যে, আদিবাসী নারী সমাজের সংগ্রাম, নারীর উপর সামরিকীকরণ, যুদ্ধ সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরূপ প্রভার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত-নিরসন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা; ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চিরায়ত অধিকার সুরক্ষা এবং নারীর উপর বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব; নারীর বিরুদ্ধে যৌন সন্ত্রাস; প্রথাগত আইন এবং আদিবাসী নারী; সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারীদের অংশীদারিত্ব এবং সংস্কৃতি ও আদিবাসী জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে বাগিও ঘোষণাপত্র নামে একটি ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রে বিশ্বায়ন এবং আদিবাসীদের ভূমি, জল, বন ও সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠন; সামরিকীকরণ ও সন্ত্রাস; থাইল্যান্ডের উপজাতীয়দের উপর নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন; মৌলিক সামাজিক সেবাসমূহে আদিবাসী নারীদের যথাযথ প্রবেশাধিকারের অভাব; আদিবাসী নারীদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও যৌন সন্ত্রাস, আদিবাসী নারীদের দুর্বল ভূমিকা ইত্যাদি সমস্যাগুলো আদিবাসীদের মৌলিক সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত করা হয়।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ

গত ১০-২১ মে ২০০৪ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৩য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রত্যেকবারের মতো এবারও বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক প্রকৌশলী মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, মিজ ফ্লোরা বাবলী তালাং ও মিজ মলয়া চিসিম, বম লিটারেচার ফোরামের লাল জোয়াম বম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পীস কেম্পইন গ্রুপের রেভারেন্ড প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু, জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্কের রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দী রায় ও মিজ আইনা হিউমও উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। অধিবেশনে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। এবছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'আদিবাসী নারী'। বাংলাদেশের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বাংলাদেশের আদিবাসী নারীদের উপর বিদ্যমান নির্যাতন ও বঞ্চনার সবিশেষ চিত্র তুলে ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সেনাশাসন ও সাড়ে চার শতাধিক ক্যাম্প বিদ্যমান রয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথিবীর সবচেয়ে সেনাশাসিত বা সামরিকীকৃত অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব ইফতেখার আহমেদের আমন্ত্রণে তাঁর অফিসে বাংলাদেশের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকালে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের উপর সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এছাড়াও প্রতিনিতিবৃন্দ হোলি সী-র স্থায়ী প্রতিনিধির সাথেও তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন ও বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

সন্তু লারমাকে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে যোগদানে সরকারের বাধাদান

গত ১০-২১ মে ২০০৪ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের তৃতীয় অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। গত ৫ মে ২০০৪ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মৌখিকভাবে এটা জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কেন অনুমতি দেয়া হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যাও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সচিবালয় থেকে উক্ত অধিবেশনে যোগদানের জন্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে"। বলাবাহুল্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রী লারমাকে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানে অনুমতি না দেয়া এটা সরাসরি বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। অপরদিকে এটা সরকারের জুম্ম বিদ্বেষী মনোভাব এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণকে বিশ্বের আদিবাসী আন্দোলন তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার হীন বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয় বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে যোগদানে সরকারী অনুমতি (জিও) না দেয়ার প্রতিবাদে ১০-২১ মে ২০০৪ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্থায়ী ফোরামের চলাকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১০০টি আদিবাসী সংগঠন এবং আদিবাসী ও মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এই অবৈধ, বৈষম্যমূলক ও মানবাধিকার বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিবৃন্দ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চেয়ারম্যান মি. এ্যালিহেনরিক মাগা'কে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে কেন শ্রী লারমাকে জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানে অনুমতি দেয়া হলো না তার ব্যাখ্যা চাওয়া এবং আদিবাসী নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশের অবাধে বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করা এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারকে পত্র প্রেরণ করার জন্য আদিবাসী সংগঠন এবং আদিবাসী ও মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদকের অংশগ্রহণ

গত ২৫ জুলাই থেকে ৪ আগষ্ট ২০০৪ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার চার্লস ডারউইন বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাই অংশগ্রহণ করেন। নর্থার্ণ ল্যান্ড কাউন্সিল ও চার্লস ডারউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের জ্ঞান-পদ্ধতি বিষয়ক স্কুলের সহযোগিতায় ডিপ্লোমেসী ট্রেনিং প্রোগ্রাম কর্তৃক এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও বার্মা, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউ গিনি, পশ্চিম পাপুয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণে আদিবাসী অধিকার, নারী অধিকার, মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, জাতিসংঘ কাঠামো ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, শিশু অধিকার, পরিবেশ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বার্সেলোনা সাংস্কৃতিক ফোরামে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির যোগদান

গত ৯ মে থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তিনটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন এবং শান্তির শর্তাবলী-এর উপর ভিত্তি করে "ফোরাম বার্সেলোনা ২০০৪" নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেষে অবস্থিত স্পেনের বার্সেলোনা শহরে। এ সম্মেলন ইউনিভার্সেল ফোরাম অফ কালচার বা বার্সেলোনা কালচারাল ফোরাম নামেও পরিচিত। ইউনেস্কোর পূর্ণ সহযোগিতায় যৌথভাবে এ ফোরামের আয়েজন করে বার্সেলোনা সিটি সরকার, ক্যাটালান স্বায়ত্বশাসিত সরকার এবং স্পেনিশ সরকার। এ ফোরামকে বিশ্ব নাগরিকদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এবং এখানে একবিংশ শতাব্দীর জরুরী ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় যার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সম্মেলন ঘটানো এবং আলোচনা করার উপযুক্ত প্লাটফর্ম গড়ে তোলা।

এ সম্মেলনের একটি অংশ হিসেবে ৮-১৪ আগষ্ট ২০০৪ এক সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব যুব সমাজের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্ব যুব উৎসব। এই ওর্য়াল্ড ইয়ুৎ ফেস্টিভাল জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার অফিস এবং বার্সেলোনা সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার অফিসে বিভিন্ন সময়ে যে সকল আদিবাসী ফেলোশীপ নিয়েছেন সেই সকল আদিবাসী ফেলোগণের মধ্যে ৩০ জন এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের প্রাক্তন ফেলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সহকারী সম্পাদক মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি, মানবাধিকার, মহিলা, শিশু ও যুবক এবং পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখিত বিষয়ের উপর আলোচনার পর আদিবাসী মিলেনিয়াম উন্নয়ন পরিকল্পনা শীর্ষক এক প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়।
উক্ত উৎসব চলাকালে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার অফিসের উদ্যোগে ৯ আগষ্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উৎযাপন করা হয়। এ দিবসের অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল আদিবাসী প্রদর্শনী স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ফোরাম ডায়লগ এ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ। পরিশেষে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী ফেলোরা আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রাক্তন ফেলোদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ সংগঠনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে আগামী ২০০৫ সালের মার্চ ভেনিজুয়েলায় পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপির প্রতিনিধির যোগদান

সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক উদ্ভাষণ চাকমা যোগদান করেন। এছাড়া চাকমা সার্কেল চীফ ও টংগ্যার সভাপতি রাজা দেবাশীষ রায়ও যোগদান করেন। ওয়ার্কিং গ্রুপে যোগদানের আগে মঙ্গল কুমার চাকমা ডোসিপ ও হারিডক্স্ কর্তৃক আয়োজিত ডকুমেন্টাশন বিষয়ক প্রশিক্ষণে এবং ওয়ার্কিং গ্রুপে যোগদানের পরে উদ্ভাষণ চাকমা ইউনিটার কর্তৃক আয়োজিত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।
জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের এবারের অধিবেশনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "আদিবাসী জনগণ এবং সংঘাত নিরসন"। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের গড়িমসি করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির উত্তরোত্তর অবনতির কথা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার রক্ষায় সুনাম অর্জন করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে বলে প্রতিনিধিবৃন্দ তুলে ধরেন। অধিবেশনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছাড়াও বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব, সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যেকার সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ক সেমিনার, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সহযোগিতা ইত্যাদি আলোচ্য বিষয়সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থা, ভূমি বেদখল, নারী ও শিশু নির্যাতন ও অপহরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রবাহ

রাঙামাটিতে শ্রমিক সমাবেশে সন্তু লারমা

গত ৯ জানুয়ারী ২০০৪ তারিখে রাঙ্গামাটি পৌর মিলনায়তনে জেলা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের অভিষেক অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু লারমা। সভাপতিত্ব করেন পরেশ মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাবিব, শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি দিলীপ কুমার দেব, জাহাঙ্গীর আলম মুন্না প্রমুখ। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এয়াকুব আলী। অনুষ্টানে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোথাও সামরিক শাসন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাক্যাম্প মোতায়েন রাখায় এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারছে না। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বাঙালী ছাত্র পরিষদের উস্কানীতে রাঙ্গামাটিতে কতিপয় এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলা

গত ২৩ জানুয়ারী ২০০৪ বিকাল ৪টার দিকে বাঙালী ছাত্র পরিষদের কয়েকজন কর্মী ট্যাক্সি যোগে বিভিন্ন উস্কানীমূলক ও সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে মাইকিং করে বনরূপার দিক থেকে এসে কলেজ গেইটের দিকে চলে যায়। এসময় প্রধান সড়ক সংলগ্ন কল্যাণপুরের মুখে অবস্থানরত কয়েকজন পাহাড়ী যুবক বাঙালী ছাত্র পরিষদের এই উস্কানীমূলক এবং সন্তু লারমার ব্যাপারে কটুক্তিমুলক শ্লোগানের বিষয়টি লক্ষ্য করে। এরপর বাঙালী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা পুনর্বার কলেজ গেইটের দিক থেকে এসে কল্যানপুরের মুখে ট্যাক্সিটি থামিয়ে সন্তু লারমার বাসবভনের দিকে লক্ষ্য করে প্রায় ১০ মিনিট ধরে সন্তু লারমার ব্যাপারে অশ্রাব্য, অরাজনৈতিক ও কটুক্তিমূলক শ্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তারা শ্লোগান দেয় 'বাঙালী হত্যাকারী সন্তু লারমার ফাঁসি চাই, দিতে হবে', 'খুনী সন্তু লারমার আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও', পাহাড়-জঙ্গল ঘেরাও করো, শান্তিবাহিনী খতম করো', 'একটা দুইটা চাকমা ধরো, সকাল-বিকাল নাস্তা করো'। এসময় তৎস্থলে অবস্থানরত পাহাড়ী যুবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে বাঙালী ছাত্র পরিষদের কর্মীদের উক্ত স্থানে এভাবে মাইকিং না করে অন্যত্র চলে যেতে বলে। এতে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে বাঙালী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা বনরূপার দিকে রওনা দেয়। কিন্তু কিছু দূর এসেই তারা মাইকিং এর ট্যাক্সিটি বদলিয়ে অন্য ট্যাক্সিতে আবার কলেজ গেইটের সেটেলার বাঙালী এলাকায় চলে আসে। এর পরপরই বাঙালী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা কলেজ গেইট এলাকা হতে নানা উস্কানী দিয়ে কিরিচ, লাঠিসোটা, পাইপগানসহ বেশ কিছু বাঙালী এনে কল্যাণপুর এলাকায় পাহাড়ীদের উপর হামলা শুরু করে।

হামলার শুরুতে প্রধান সড়ক সংলগ্ন কল্যাণপুরের মুখে অবস্থানরত পাহাড়ীরা পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরপরই এলাকার পাহাড়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে হামলাকারীদের প্রতিরোধ করতে উদ্যোগ নেয়। এভাবে কল্যাণপুরের মুখে পাহাড়ী-বাঙালী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষের খবর পেয়েই তৎসময়ে কল্যাণপুরে সন্তু লারমার বাসভবনে অবস্থানরত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির ভূমি ও আইন বিষয়ক সম্পাদক রক্তোৎপল ত্রিপুরা পরিস্থিতি শান্ত করার লক্ষে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনার সময় মাত্র দুয়েকজন পুলিশ থাকলেও তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। এসময় শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা একেবারে সামনে গিয়ে উভয়পক্ষকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্ত বাঙালী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বাধীন বাঙালীরা ছিল আক্রমনাত্মক। এসময় বাঙালীদের ছোড়া পাথরের একটি খন্ড এসে রক্তোৎপল ত্রিপুরার পায়ে লাগলে পায়ে ঘা এর সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে রক্তোৎপল ত্রিপুরা একাধিকবার এএসপির কাছে ফোন করে পরিস্থিতির ব্যাপারে অবহিত করেন এবং অবিলম্বে আরও ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার অনুরোধ জানান। পরে পুলিশ, আর্মি ও জনসংহতির সমিতির নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ও সহযোগিতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

উল্লেখ্য, ঘটনার সূত্রপাত কল্যাণপুর সড়কে হলেও বনরূপা, কলেজ গেইট ও মোটেল জর্জ এলাকায় বেশ কয়েকজন নিরীহ পাহাড়ী পথচারীকে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে আহত করা হয়। বিশেষ করে কল্যাণপুরে হামলার প্রাক্কালে কলেজ গেইট সড়কে চট্টগ্রামগামী বিরতিহীন বাসের জন্য অপেক্ষারত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার সভাপতি সমর বিজয় চাকমা অতর্কিতে হামলাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। হামলাকারীরা বিচ্ছিন্নভাবে সমর বিজয় চাকমাকে প্রহার করে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং ডানহাতে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হন। অপরদিকে এসময় তবলছড়ি থেকে আসতে থাকা যশেশ্বর চাকমা বিল্টু(৩৮) নামে এক পাহাড়ী ব্যবসায়ী বনরূপায় পৌঁছলে বাঙালী ছাত্র পরিষদ ও জামাতে ইসলামীর কয়েকজন কর্মী কর্তৃক পথরোধ ও মারধরের শিকার হন। এসময় পরিচিত জনৈক এক বাঙালীর সহয়োগিতায় বিল্টু চাকমা রক্ষা পান।

এছাড়া ঘটনা পরম্পরায় খোরশেদ আলম নামে এক সেটেলারের নেতৃত্বে আমানতবাগের মোটেল জর্জ এলাকায়ও চট্টগ্রাম থেকে আসা বাস থামিয়ে বেশ কয়েকজন পাহাড়ীর উপর হামলা চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এক মহিলাসহ বেশ কয়েকজন পাহাড়ী এই হামলায় মারধরের শিকার হন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পরে সেখানে প্রহৃত পাহাড়ীদের নাম জানা যায়নি। এদিন আঞ্চলিক পরিষদ এর অফিস স্টাফ হীরা তঞ্চঙ্গ্যা ও সুদত্ত চাকমাও হামলার শিকার হন। অপরদিকে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও পাহাড়ী কর্তৃক কোন বাঙালী হামলার শিকার হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু তারপর দিন ২৪ জানুয়ারী 'দৈনিক ইত্তেফাক', দৈনিক জনকণ্ঠ' ও 'The Daily Observer'সহ কয়েকটি পত্রিকায় উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত দুঃখজনক পাহাড়ী-বাঙালী সংঘর্ষের ঘটনার সংবাদকে একতরফা ও মিথ্যাভাবে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে উল্লেখ করা হয়, 'বাঙালী ছাত্র ঐক্য পরিষদ মাইকিং শুরু করলে কল্যাণপুরে উপজাতীয়রা উক্ত সংগঠনের ট্যাক্সি আটকিয়ে মাইক কেড়ে নেয় এবং হামলা চালায়। এর পরপরই উভয় গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়'। দৈনিক জনকণ্ঠে বলা হয়, 'শনিবার আহুত সমাবেশের সমর্থনে বাঙালী ছাত্র পরিষদের কয়েক কর্মী শুক্রবার বিকেলে একটি বেবিট্যাক্সি নিয়ে মাইকিং শুরু করে। ট্যাক্সিটি কলেজ গেইট এলাকায় পৌঁছলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা তাতে হামলা চালায়'। অপরদিকে ইউএনবি-র বরাত দিয়ে 'The Daily Observer' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, '...the clash erupted in the afternoon when Pahari Chhatra Parisad activists attacked the supporters of Bangalee Chhatra Parisad when they reached Kalyanpur after miking in the town for their rally...'।

উক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত উপরোক্ত সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একতরফা, সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন এবং প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করবার অপচেষ্টা বৈ অন্য কিছু নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

টিটিসি রোডে পাহাড়ীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি

গত ২৫ জানুয়ারী ২০০৪ বিকেলের দিকে রাঙামাটি কলেজের পার্শ্ববর্তী টিটিসি সড়ক সংলগ্ন একটি খালি জায়গায় একদল পাহাড়ী যুবক ভলিবল খেলছিল। এমন সময় একদল বাঙালী যুবক কলেজের পার্শ্ববর্তী টিলা থেকে পাহাড়ী যুবকদের দিকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। এতে দীলিপ চাকমা (৪০) নামে এক পাহাড়ী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত হয় এবং তৎক্ষনাৎ তাকে রাঙামাটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় তৎস্থলে উপস্থিত পাহাড়ী যুবকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপকারী বাঙালী যুবকদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে বাঙালী যুবকরা কলেজের পশ্চিমপার্শ্বে পৌঁছলে হঠাৎ পিস্তল ও পাইপগান বের করে। ফলে পাহাড়ী যুবকরা আর অগ্রসর না হয়ে নিজেদের পাড়ার দিকে সরে আসে। এসময় আসার পথে সম্মুখে পড়া এক বাঙালী শ্রমিক কিছুটা উত্তেজিত এক পাহাড়ী যুবক কর্তৃক দুঃখজনকভাবে মারধরের শিকার হলে তৎস্থলে উপস্থিত অন্যান্য পাহাড়ীরা বাঙালী শ্রমিকটিকে রক্ষা করেন।

অপরদিকে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া বাঙালী যুবকরা নানা উস্কানী দিয়ে কলেজ গেইটে সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে এবং তারা লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় বের হলে উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। জানা যায়, এমন সময় একদল সেনাসদস্য ঘটনাস্থলে আসে। তারা তৎক্ষণাৎ তদন্ত করে ঘটনাটি জানতে পেরে ইটপাটকেল নিক্ষেপকারী বাঙালী যুবকটিকে খুঁজে বের করে এবং একপর্যায়ে তারা সেই বাঙালী যুবকটিকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আছে। এলাকাবাসীদের মতে, এভাবে প্রায়ই টিটিসি সড়ক সংলগ্ন পাহাড়ী বাড়ীতে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়। সর্বশেষ গত ৩১ জানুয়ারী ২০০৪ তরুন চাকমার বাড়ীতে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়।

বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলায় পিসিপি সদস্যদের উপর সেনা সদস্য ও সেটেলার কর্তৃক মারধর

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ বৃহস্পতিবার বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রুমা থানা কমিটির সদস্য উহলাচিং মারমা (২২) ও মং উচিং মারমা (২২) রাত প্রায় ৯ টায় বাড়ীর পার্শ্ববর্তী ছড়ায় মাছ ধরতে যায়। কিন্তু ছড়ায় মাছ না পেয়ে তারা আনুমানিক রাত ১০ টায় রুমা বাজারস্থ হোটেলে তরকারী খুঁজতে যায়। তারা ২/১ টি হোটেলে মাছ তরকারী খোঁজ করে। কিন্তু কোন হোটেলেই মাছ তরকারী না পেয়ে তারা বাড়ীতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। ফেরার পথে বাজারস্থ নিবারন কর্মকার ও নুরু হোসাইন নামের দুই ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উক্ত দুই সদস্যকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দুই সদস্য প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের বাকবিতন্ডা হয় এবং এর এক পর্যায়ে নিবারন কর্মকার অতর্কিতে উহলাচিংকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন প্রায় রাত ১১ টা।

এদিকে স্থানীয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অপরাপর কর্মীরা ঘটনাটি জানতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ তারা ঘটনাস্থলে চলে আসে। এসময় তারা কিছুটা উত্তেজনাবশে নিবারন কর্মকার ও নুরু হোসাইনকে তৎস্থলে পেয়ে মারধর করতে উদ্যত হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে

বাজারের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং বিবাদ মিটে যায়। কিন্তু বিবাদ মিটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই নিবারন কর্মকার ও নুরু হোসাইন গোপনে রুমা সেনা ক্যাম্পে খবর দেয় যে, কতিপয় উপজাতি রুমা বাজারে ডাকাতি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে সেনা সদস্যরা রাত সাড়ে ১২ টার দিকে রুমা বাজারে হানা দেয়। এসময় বাজারে অবস্থানরত পাহাড়ীদের উপর সেনা সদস্যরা নির্বিচারে মারধর-অত্যাচার চালায় এবং বাজার সংলগ্ন জুম্মদের বাড়ীতে ঢুকে তল্লাশী, জিনিসপত্র তছনছ ও বাড়ীর লোকদের মারধর করে। উল্লেখ্য, সেনা সদস্যরা বাজারে আসার সময় নিবারন কর্মকার ও নুরু হোসাইন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ডাকাত-ডাকাত বলে চিৎকার করে।

সেনা সদস্যদের নির্যাতনে উহলাচিং মারমা গুরুতরভাবে জখম হয়। বর্তমানে সাত সেলাই নিয়ে সে রুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উহলাচিং ছাড়াও এই সেনা নির্যাতনের ফলে জখম আরও ২ জন পাহাড়ীকে রুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উক্ত ঘটনার কারণে রুমা জনসাধারণ পরের দিন হরতাল পালন করেছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক দীঘিনালার জামতলীতে নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ী তল্লাসী

১ লা মার্চ ২০০৪ ভোর ৪ টার দিকে দীঘিনালা ব্রিগেডের অধীন কবাখালী আর্মী ক্যাম্পের একদল সিপাহী দীঘিনালার জামতলী গ্রামের নিরু চাকমা, পিতা- চন্দ্রবাহন চাকমার বাড়ীতে হানা দেয়। সিপাহীরা বাড়ীটি ঘিরে তল্লাসী চালায় কিন্তু কিছুই না পেয়ে নিরু চাকমাকে বলে যে, তাদেও কাছে তথ্য ছিল তার বাড়ীতে অস্ত্র রয়েছে। যে কারনে তারা তার বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়েছে। পরে আর্মীরা ক্ষমা চায় এবং জিজ্ঞেস করে যে তার কোন ভাই দিল্লীতে বাস করে কি-না। নিরু চাকমা বলে যে, তার কোন ভাই দিল্লীতে থাকে না।

পরের দিন সকালে দীঘিনালা ক্যান্টনমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার নিরু চাকমার বাড়ীতে আসে। কিন্তু তখন নিরু চাকমা বাড়ীতে ছিল না। তখন কমান্ডিং অফিসার নিরু চাকমার পরিবারকে নির্দেশ দেয় যেন সে সকাল ১১টার মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে যোগাযোগ করে। এ অবস্থায় নিরু চাকমা নিদারুণ উৎকন্ঠায় দিনাতিপাত করছেন।

অপরদিকে একই দিনের ভোররাত ২.৫০ টার দিকে একই ক্যাম্পের আর্মীরা মেরুং ইউনিয়নের ভৈরপ্যা গ্রামের জগতজ্যোতি চাকমা, পিতা- চোখকালা চাকমা, সুজ্জল চাকমা, পিতা-প্রফুল্ল চাকমা এর বাড়ী ঘেরাও করে ঘরের মূল্যবান জিসিনপত্র তছনচ করে দেয়। উল্লেখ্য যে, এরা উভয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্রজমাদানকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য।

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক একজন জুম্ম শরণার্থীকে মারধর

গত ১৬ মার্চ ২০০৪ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার ছোট মেরুং ইউনিয়নের মধ্য বোয়ালখালী বাজারে একদল সেটেলার কর্তৃক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী তুষার বিন্দু চাকমা (৫৭) পীং মৃত পূন্য কমল কার্বারীকে বেদম মারধর করে। জানা যায় যে, পার্শ্বস্থ মাদ্রাসায় রাত্রে কে বা কারা পায়খানা করলে তারপর দিন সকালে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা (সেটেলার বাঙ্গালী) এজন্যে তুষার বিন্দু চাকমা দায়ী করে এবং পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য হুকুম দেয়। কিন্তু তুষার বিন্দু চাকমা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হচ্ছে বলে জানায় এবং পায়খানা পরিষ্কার করতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় একপর্যায়ে সেটেলার বাঙ্গালীরা তুষার বিন্দু চাকমাকে ধরে দলবদ্ধভাবে মারধর করে এবং মাটিতে শুইয়ে টানা হেঁচড়া করে। এরপর তার বাড়ী ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এই ঘটনার জের ধরে সেটেলার বাঙ্গালীরা পার্শ্ববর্তী ব্রজেন্দ্র চাকমার বাড়ীও ভাঙচুর ও লুটপাট করে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙ্গালী সংঘবদ্ধ গণহত্যার কারণে তুষার বিন্দু চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি ভারতে চলে যাওয়ার পর সেটেলার বাঙ্গালী তার জায়গা-জমি বেদখল করে সেখানে উক্ত মাদ্রাসাটি নির্মাণ করে। শরণার্থী থেকে দেশে ফেরার পর শত চেষ্টা করেও আজ অবধি তিনি তার জায়গা-জমি ফেরৎ পাননি। পক্ষান্তরে তার অবশিষ্ট জায়গা-জমিও বেদখলের জন্য সেটেলার বাঙ্গালী প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে সেটেলার বাঙ্গালীরা উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তুষার বিন্দু চাকমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ছানেউ মারমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার

গত ২২ মার্চ ২০০৪ বিকাল আনুমানিক ৫.০০ ঘটিকায় দীঘিনালা জোনের মেজর আশফাক-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য কোন অজুহাত ছাড়াই খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বড়াদম বাজারের কিনাধন চাকমার দোকানঘর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য শ্রী ছানেউ মারমাকে (৩০) গ্রেপ্তার করে এবং অমানুষিকভাবে মারধর করার পর অস্ত্র মামলার জড়িত করে তারপরদিন তাকে দীঘিনালা থানার (এস আই হারুনর রশিদ) নিকট সোপর্দ করে। উল্লেখ্য যে, দীঘিনালার জোড়া ব্রিজ নামক স্থানে চাঁদাবাজি প্রস্তুতিকালে একটি নাইন এম এম সাব-মেশিনসহ ছানেউ মারমাকে সেনা সদস্যরা আটক করে বলে উক্ত অস্ত্র মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বলাবাহুল্য যে, ২২ মার্চ বড়াদম বাজারের কিনাধন

চাকমার দোকানঘর থেকে গ্রেপ্তারের সময় বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শ্রীমতি গোপা দেবী চাকমা ও তাঁর সচিব জগদীশ চাকমা, দীঘিনালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমাসহ অনেক ইউপি সদস্য ও স্থানীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ছানেউ মারমা জনসংহতি সমিতির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার একজন সদস্য। তিনি জীবিকার তাগিদে দীঘিনালায় অবস্থান করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যেই এভাবে সেনাবাহিনী সাজানো ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হয়রানির অপচেষ্টা করছে।

বরকল জোনের বিডিআর সদস্যরা জেএসএস বরকল থানা সভাপতিকে বহনকারী বোট আটক

গত ২৮ মার্চ ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম শেষে জনসংহতি সমিতির বরকল থানা শাখার সভাপতি জ্ঞান তালুকদার ট্রলার যোগে বাড়ী ফেরার সময় ৩৪ রাইফেলের বরকল বিডিআর জোনের চেকপোষ্টে পৌছলে বিডিআর সদস্যরা থামায়। থামানোর বিডিআর সদস্যরা ট্রলার ও আরোহীদের ব্যাপক তল্লাসী চালায়। তল্লাসীর পর কোন কিছু না পেয়ে বিডিআরের দুই সদস্য জ্ঞান তালুকদারকে অহেতুক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। একপর্যায়ে জানায় যে, জোন কম্যান্ডার অনুমতি ছাড়া রাত্রে চলাফেরা নিষিদ্ধ। কম্যান্ডারের এই নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে বিডিআর সদস্যরা বোর্টের হ্যান্ডেল করে। একপর্যায়ে জোন কম্যান্ডারের সাথে কথা বলতে গেলে জোন কম্যান্ডার হুমকি দেয় যে, রাত্রে চলাফেরা করা যাবে না। চলাফেরা করতে গেলে তার থেকে অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে। অবশেষে অনেক বাক-বিতন্ডার পর বিডিআর সদস্যরা বোর্ট ও বোর্টের হ্যান্ডেল ফেরৎ দেয়।

আলুটিলায় অবিরাম সেনা অভিযান এবং নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেপ্তার ও নির্যাতন

গত ১ এপ্রিল ২০০৪ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের আলুটিলা এলাকার হৃদয় মেম্বার পাড়ায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটলে গ্রামবাসী তিন জন ডাকাতকে ধরে স্থানীয় ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের হাতে সোপর্দ করে। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই সেনা সদস্যরা আশ্চর্যজনকভাবে গ্রামবাসীদেরকে নানাভাবে হয়রানী করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে ১০ এপ্রিল ২০০৪ খাগড়াছড়ি সদরের চন্দ্রপাড়া ক্যাম্পের লে. আশরাফ এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য সামরিক অভিযান চালিয়ে আলুটিলার হৃদয় মেম্বারপাড়া এলাকার চন্দ্র মোহন ত্রিপুরা (২৫), বাবুল জ্যোতি ত্রিপুরা (৩০) ও শ্যামল জ্যোতি ত্রিপুরা (৩২) নামে তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে এবং পরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

এই ডাকাতি ঘটনার অজুহাতে ১২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখেও বিকাল ৫ টায় সেনা সদস্যরা উক্ত গ্রামে সেনা অভিযান চালায়। এতে সুনীল ত্রিপুরা (১৬), কালয় চান ত্রিপুরা (১৭) ও উন্নয়ন বোর্ডের বাগান রক্ষী দয়াল চাকমাকে মধ্যরাত পর্যন্ত আটকে রেখে নৃশংসভাবে নির্যাতন চালানো হয়। সর্বশেষ ১৩ এপ্রিল ২০০৪ বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু ও বিষু উৎসবের প্রথম দিনেও সেনা সদস্যরা আবার অপারেশন চালায়। এতে সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীর অনেককে নানাভাবে হয়রানী করে। এমনকি তাদেরকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হুমকীও প্রদান করা হয়। ফলে তাদের নিরাপদে ও যথাযথভাবে উৎসব পালন ব্যাহত হয়।

আর্মী কর্তৃক মাটিরাঙ্গার একজন স্বাস্থ্য কর্মীকে শারীরিক হয়রানি

গত ১৫ এপ্রিল ২০০৪ সকাল ৮টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন শিচক সেনা ক্যাম্পের সেকেন্ড লেফটেনেন্ট মেহেদীর নেতৃত্বের একদন সেনা মাটিরাঙ্গার ওয়াছু মৌজার তৈকুন্ডার গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানকালে বিনা অপরাধে তৃণমূল নামক স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মী প্রবীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে আটক করে চোখ বেঁধে ও পেছনে হাতমোড়া করে রেঁধে রাখে। বিভিন্ন হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসীরা কোথায় আছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে প্রায় ঘন্টা বাদে তাকে ছেড়ে দেয়।

নানিয়ারচরে সেটেলাররা একজন জুম্মকে হত্যা করেছে

১৭ এপ্রিল ২০০৪ রাতে ইউপি সদস্য সালাম এর নেতৃত্বে একদল সেটেলার বাঙালী নানিয়ারচর উপজেলার তৈচাকমামুখ পাড়ার শান্তি রঞ্জন চাকমা (৪৫)কে খুন করেছে। সেটেলাররা তাকে ইসলামপুর সেটেলার গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুকুরমারা এলাকায় ধরে ফেলে ও খুন করে। তার মৃতদেহটি নানিয়ারচর এলাকার লেকে পাওয়া যায়। খুন হওয়া ব্যক্তির ছেলে পাপুল চাকমা ৫জন সেটেলার বাঙালীর নামে নানিয়ারচর থানায় কুনের মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এ পর্যন্ত সালামকে গ্রেফতার করলেও অন্যান্য আসামীদের গ্রেফতারের কোন চেষ্টা করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিডিআর কর্তৃক লংগদু'র রাঙীপাড়ায় বাড়ী ঘেরাও ও মহিলাদের হয়রানি

গত ১৮ এপ্রিল ২০০৪ লংগদু উপজেলার গুলসাখালী বিডিআর জোনের তেমাথা পোষ্টের সুবেদার কুদ্দুস-এর নেতৃত্বে একদল সদস্য উপজেলার রাঙীপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে জুম্মদের ঘরবাড়ী ঘেরাও ও বাড়ীর মহিলাদের হয়রানি করে। বিডিআর সদস্যরা সেদিন রাঙীপাড়ার স্নেহময় চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে। এসময় স্নেহময় চাকমা বাড়ীতে ছিল না। বাড়ী তল্লাসী করে কোন কিছু না পাওয়া

সত্ত্বেও বিডিআর সদস্যরা স্নেহময় চাকমা স্ত্রীকে একটি কাগজে স্বাক্ষর করতে নির্দেশ দেয়। তল্লাসী করে বাড়ীতে একটি শর্টগান পাওয়া গেছে মর্মে উক্ত কাগজে লেখা ছিল। এই মিথ্যা তথ্য সম্বলিত কাগজে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে দু'জন বিডিআর সদস্য স্নেহময় চাকমার স্ত্রীর দু' হাত ধরে টানা হেছড়া করতে থাকে। একপর্যায়ে স্নেহময় চাকমার স্ত্রীর ব্লাউজ ছিড়ে যায়। এমতাবস্থায় ভয়ে তিনি উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করেন। এরপর যাওয়ার সময় বিডিআর সদস্যরা স্নেহময় চাকমাকে তারপর দিন বিডিআর জোনে হাজির দিতে নির্দেশ দিয়ে যায়।

গুইমারায় আর্মীরা দুজন জুম্মকে পিঠিয়েছে

২৭ এপ্রিল ২০০৪ বিকাল ৪টার দিকে গুইমারা ব্রিগেডের চন্দ্রপাড়া ক্যাম্পের (২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট) ক্যাপ্টেন মো. আশফাক এর নেতৃত্বে একদল আর্মী মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা গ্রামের দুজন নিরীহ জুম্মকে ক্যাম্পে নিয়ে প্রচন্ডভাবে পিঠিয়েছে। মারধোরের শিকার জুম্মরা হলেন-

১) গজেন্দ্র ত্রিপুরা, ৪২. পিতা- মৃত পৈদা কুমার ত্রিপুরা

২) বাবুল জ্যোতি ত্রিপুরা, ১৭, পিতা- চানকিশোর ত্রিপুরা

পরে তাদেরকে মারাত্মক আহত অবস্থায় মাটিরাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারা এখনো আশংকাজনক অবস্থায় হাপাতালে রয়েছেন।

নানিয়ারচরে আর্মীরা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বাড়ী ঘেরাও করেছে

১২ মে ২০০৪ নানিয়ারচর জোনের মেজর কাদের (২৪ ইবিআর) এর নেতৃত্বে একদল আর্মী ও পুলিশ নানিয়ারচর বাজারে বসবাসকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য সুদত্ত বিকাশ চাকমা, ৩৬, পিতা-ত্রিপুরাচরণ চাকমা এবং কাজল দেওয়ান, পিতা- মৃত দেবাল কুমার দেওয়ান এর বাড়ী ঘেরাও করে এবং নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-

১) সুদত্ত বিকাশ চাকমা, ৩৬, পিতা- ত্রিপুরাচরণ চাকমা

২) কাজল দেওয়ান, পিতা- মৃত দেবাল কুমার দেওয়ান

৩) পাপুল খীসা, ৩২, পিতা- অমিয় রঞ্জন খীসা

৪) পার্বন চাকমা, ১৬, পিতা- জ্ঞানরঞ্জন চাকমা

৫) দেবব্রত চাকমা, ৩৮, পিতা- কর্মদাস চাকমা

৬) পাদানমুনি চাকমা, ৩২, পিতা- শান্তিরঞ্জন চাকমা এবং অন্য আরও দুজন ব্যক্তি।

প্রথমোক্ত ৪ জনকে সকালে ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাদবাকীদের তারপরের দিন হয়রানি করে ছেড়ে দেয়া হয়। আর্মীরা দুস্কৃতিকারী ধরার নামে তাদের বাড়ীতে চড়াও হয়। মেজর কাদের পাপুল খীসার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে যে, পঞ্চানন চাকমার সাথে তার কোন বিরোধ রয়েছে কি-না। পাপুল খীসা কোন বিরোধ নেই বলে জানান। ধারণা করা হয় যে, আর্মীরা ইউপিডিএফ এর সমর্থকদের নিয়ে তাদের হয়রানি করার জন্যে তাদের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়েছে। কেননা এটা সবাই জানে যে, পঞ্চানন চাকমা হলো ইউপিডিএফ এর একজন সক্রিয় সমর্থক।

লংগদুতে সেনাক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুর আর্মীরা রাঙ্গাপানি ছড়ায় একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য ১২ মে ২০০৪ মাইনীমুখ জোনের বামে লংগদু সাবজোনের একদল আর্মী উক্ত এলাকা ঘুরে আসে। এসময়ে তারা তাদের পছন্দনীয় জায়গার মালিক অমরজীবন চাকমা, পিতা- নারায়ণ চাকমা এবং মোহনচান চাকমার সাথে কথা বলেন। এলাকাবাসী জানান যে, উক্ত জায়গায় সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হলে ১৩ পরিবার জুম্ম উদ্বাস্তু হয়ে পড়বেন। তাছাড়া অমরজীবন চাকমার হোল্ডিং নং এইচ-১৩৭/খ মূলে ৪ একর জায়গা এবং অন্য হোল্ডিং এইচ-১৩৭/খ এর ১ একর জায়গা বেহাত হয়ে যাবে। একারনে ভূমির মালিকরা মাইনীমুখ জোনের সেকেন্ড ইন কমান্ড এর কাছে উক্ত জমি দখল না করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু কমান্ডার জানান যে, সরকার তার প্রয়োজনে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করবেন। তিনি বরং তাদেরকে ভূমি ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। শেষে তিনি হুমকী দেন যে, ভূমি ছেড়ে চলে না গেলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবেন।

লংগদুতে বিডিআর কর্তৃক একজন জুম্ম মহিলাকে হয়রানি

১৮ মে ২০০৪ লংগদুর রাজনগর জোনের টেমেটা পোস্টের সুবেদার কুদ্দুসের নেতৃত্বে এদল বিডিআর সদস্য রাঙ্গাপানি ছড়ার সেন্হময় চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে। এসময় স্নেহময় চাকমা বাড়ীতে ছিল না। বিডিআর সদস্যরা তার সারা বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং তার স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে যেখানে লেখা ছিল যে, তার বাড়ীতে একটি শর্টগান ও তিনটি কার্তুজ পাওয়া গেছে। যখন মহিলাটি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন বিডিআর সদস্যরা তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে

এবং বাড়ীঘর তছনচ করে দেয়। ষেষে তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। পরে বিডিআর সদস্যরা তাকে নির্দেশ দেয় তার স্বামী যেন বিডিআর ক্যাম্পে গিয়ে যোগাযোগ করে।

বাঘাইছড়িতে সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক এইচএসসি পরীক্ষার্থী জুম্ম ছাত্রদের ধাওয়া

২৭ মে ২০০৪ বাঘাইছড়ি উপজেলার কাচলং কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা শেষে বাড়ী ফেরার পথে দু'জন পাহাড়ী ছাত্রকে বাঙালীরা ধাওয়া করেছে। সৌভাগ্যক্রমে ছাত্ররা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। জানা গেছে বেলা ১.৩০টার দিকে পরীক্ষা শেষে তারা বাড়ী ফেরার পথে মুসলিম ব্লক নামক স্থানে পৌঁছুলে বাঙালীরা তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। তখন ছাত্ররা কলেজের দিকে পালিয়ে আসে। পরে কলেক কর্তৃপক্ষ বিডিআর এর সহায়তায় তাদের বাড়ী পৌছে দেয়। ছাত্ররা হলো (১) শায়িকা চাকমা, ১৯, পীং- বিজয় রতন চাকমা, গ্রাম- ঝগরাবিল ও (২) টেনিস চাকমা, ২০, পীং- জ্যোতি রঞ্জন চাকমা, বড়াদম। এঘটনাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ডুলুপাড়া সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিনের হুমকি

গত ১৫ জুন ২০০৪ বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ডুলুপাড়া সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিন একদল সেনা নিয়ে সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়েনের আমতলী গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানকালে গ্রামবাসীদের একত্র করে হুমকি দেয় যে, আমতলী গ্রামে অস্ত্র রয়েছে। পরবর্তী ২০ জুনের মধ্যে অস্ত্রগুলো তার হাতে জমা দিতে হবে। অন্যথায় গ্রামবাসীদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে চালান দেবে এবং গোটা গ্রাম উচ্ছেদ করবে মর্মে হুশিয়ারী দেয়। উল্লেখ্য, এর পূর্বে ১৪ এপ্রিল ২০০৪ আমতলী গ্রামের ৫৪ পরিবারের প্রত্যেক পরিবার একজন করে ডেকে বলে যে, গ্রামের মংশৈথোয়াই মারমা (৪২) পিতা মৃত চাইথুই, অংথোয়াইচিং মারমা (৩৫) পিতা পাইচাঅং মারমা, হ্লাচিংঅং মারমা (৩০) পিতা অংশৈহ্লা মারমা, চাইশৈমং মারমা (৩২) পিতা ছাথোয়াই প্রু মারমা, মেনাক মারমা (২৯) পিতা মুইংবাইং মারমা, নিশি রতন চাকমা (৬৫) পিতা লরীন্দ্র চাকমা, অমূল্য রতন চাকমা (৩৮) পিতা লরীন্দ্র চাকমা, উশৈ মারমা (৩২) পিতা নিচাইঅং মারমা প্রমুখ গ্রামবাসীদের হাতে অস্ত্র রয়েছে মিথ্যাভাবে অভিযোগ করে। তাদের অস্ত্রগুলো জমা দিতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় সকল গ্রামবাসীকে নির্বিচারে মারধর করবে বলে হুমকি দেয়। সেনা কর্মকর্তার এই হুমকি ও হয়রানি থেকে রেহাই পাওয়ার আবেদন জানিয়ে গ্রামবাসীরা গত ১৯ জুন ২০০৪ প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের গ্রামে কারো হাতে কোন ধরনের অস্ত্র নেই। সুতরাং তারা কোত্থেকে অস্ত্র জমা দেবে। উক্ত ক্যাপ্টেন যে কোন মুহূর্তে তাদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানি চালাতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে।

বিষ্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করে বরকল বিডিআর জোন কম্যান্ডারের অস্ত্র উদ্ধারের প্রহসন

গত ২৪ জুন ২০০৪ রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলাধীন আন্দারমানিক বিডিআর ক্যাম্পের কম্যান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মুনতাসির মিজারামের অধিবাসী জ্ঞান চাকমার মাধ্যমে মাছ শিকারের নামে ৮০০ টাকার বিনিময়ে ক্লাসটিং ফিউজ ৯টি, ক্যাপ ৯টি এবং বিষ্ফোরণের পাউডার ৩টি প্যাকেজ সংগ্রহ করে। জ্ঞান চাকমা কর্তৃক উক্ত বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি উক্ত সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মুনতাসির নিকট হস্তান্তরের সময় গ্রামের সুমতি মোহন চাকমা পীং প্রতুল রঞ্জন চাকমা, রিটেন চাকমা পীং প্রেমলাল চাকমা ও সুরসেন চাকমা পীং নিলকগিরি চাকমা উপস্থিত ছিলেন। এরপর ২৮ জুন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মুনতাসির উক্ত বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি ৩৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের বরকল বিডিআর জোনের কম্যান্ডার মীর্জা আনোয়ার রেজার নিকট হস্তান্তর করে। এরপরই ৩০ জুন দৈনিক গিরিদর্পণ ও দৈনিক প্রথম আলোয় প্রচার করা হয় যে, ২৯ জুন অভিযান চালিয়ে বিডিআরা সদস্যরা আন্দারমানিক বিওপি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরবর্থী পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কিছু বিষ্ফোরক দ্রব্য ও সরঞ্জাম, ডেটোনেটর সেফটি ফিউজসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। বস্তুতঃ এই সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। ২৯ জুন বিডিআর সদস্যরা কোন অভিযান চালায়নি। জ্ঞান চাকমার মাধ্যমে সংগৃহীত বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি দেখিয়ে পত্র-পত্রিকায় বানোয়াট সংবাদ প্রচার করা হয়। বিডিআর সদস্যদের এহেন মিথ্যা ও বনোয়াট বিষ্ফারক দ্রব্য উদ্ধারের ষড়যন্ত্রে যে কেউ হয়রানি শিকার হতে এই আশঙ্কায় এখন বরকল এলাকায় জনমনে চরম ভীতি বিরাজ করছে।

বরকলে বিডিআর কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যের বাড়ী ঘেরাও

২৭ জুন ২০০৪ বেলা ১.৩০টার দিকে বরকল বিডিআর জোনের ক্যাপ্টেন আমীর ও পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর উৎপল বড়ুয়ার নেতৃত্বে একদল বিডিআর এবং পুলিশ সদস্য বরকলে জনসংহতি সমিতির সদস্য সাধন বিকাশ চাকমার বাড়ীতে তল্লাশী চালায়। তারপূর্বে তারা রাতে তার দোকানটিতে তল্লাশী চালিয়েছিল। বিডিআর সদস্যরা সাধন বিকাশ চাকমাকে জানায় যে, তার দোকানে একটি পিস্ত ল পাওয়া গিয়েছে। তাই তারা তার দোকানে পিস্তল ছিল মর্মে একটি কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। বিডিআর ও পুলিশ সদস্যরা তার পরিবারের সকল সদস্যকে বাড়ী হতে বের করে দেয়। তারা তার বাড়ী হতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র ও বইপত্র নিয়ে যায়। পরে বিডিআর ও পুলিশ সদস্যরা দেওয়ানচর মৌজার হেডম্যান নিবারণ চাকমার বাড়ীতে তল্লাশী চালায় ও সাধন বিকাশ চাকমার

মামলার অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নিবারণ চাকমা তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। তখন বিডিআর ও পুলিশ সদস্যরা তার স্ত্রীর কাছ থেকে সাদা কাগজে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে যায়।

আর্মী কর্তৃক মাটিরাঙ্গায় নিরীহ গ্রামবাসীকে কারেন্টের শক দিয়ে নির্যাতন

গত ১০ জুলাই ২০০৪ রাত ৯টায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার খেদাছড়া সেনা জোনের সদস্যরা মাটিরাঙ্গার বেলছড়ি ইউনিয়নের চৌংড়াকাপা মৌজার অধিবাসী বোবা ত্রিপুরা (৩৮) পীং শশী কুমার ত্রিপুরাকে ধরে এনে ক্যাম্পে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তাকে কারেন্টের শক দিয়ে ও শরীরে গরম পানি ঢেলে মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করে। তার কাছে অস্ত্র আছে মর্মে স্বীকার করার জন্য সেনা সদস্যরা তাকে চাপ সৃষ্টি করে এবং এর বিনিময়ে তাকে ২০ হাজার টাকা দেওয়ারও লোভ দেখায়। কিন্তু বোবা ত্রিপুরা রাজী না হওয়াতে সেনা সদস্যরা এভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

বরকলে বিডিআর কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেপ্তার ও হয়রানি

১৪ জুলাই ২০০৪ বেলা ৩টার দিকে বরকল জোনের কমান্ডার মো. মির্জা আনোয়ার রেজা (৩৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন) ও জগন্নাথ ছড়া ক্যাম্পের নাসিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একদল বিডিআর জওয়ান মংহাচিং মারমার বাড়ীতে তল্লাশী চালায় এবং তাকে ও একজন হাতীর মাহুতকে গ্রেফতার করে। পরে তাদেরকে জগন্নাথ ছড়া ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত নির্যাতন চালানো হয়। পরদিন তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

কাউখালীতে নতুন ক্যাম্প স্থাপন

ঘাগড়া জোন কর্তপক্ষ রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী থানার পানছড়ি নামক গ্রামে নতুন করে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে ক্যাম্প স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এজন্য তারা পানছড়ি গ্রামের এক গ্রামবাসীর কাছ থেকে দুই একরের মতো ভূমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু গ্রামবাসীটির সেনা কর্তৃপক্ষেও কাছে ভূমি বিক্রয় করতে অসম্মতি জানায়। একারনে ভূমি বিক্রয়ের জন্য আর্মীরা উক্ত গ্রামবাসীর উপর চাপ দিয়ে আসছে। পরে জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে দুজন ব্যক্তির বন্দোবস্তীকৃত ভূমির উপর আর্মীরা ঘিলাছড়িমুখ তালুকদার পাড়া গ্রামে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। ভূমির মালিকরা হলেন-

১) প্রীতিবিকাশ তালুকদার, পিতা- লগ্নমোহন তালুকদার
২) সাধন বিকাশ চাকমা, পিতা- হরিকান্ত চাকমা, ১০১ ঘিলাছড়ি মৌজা

এই ক্যামটি স্থাপনের জন্য সুবেদার মেজর রফিকের নেতৃত্বে একদল সেনা জওয়ান ১৬ জুন তারিখে তালুকদারপাড়া জুনিয়র হাই স্কুলের পাশে তাবু গাড়ে। এতে উক্তব্যক্তিরা অনেকবার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন প্রতিকার পায়নি।

এখন আর্মীরা নিরীহ লোকজনদের হয়রানি করছে। ১৮ জুন তারিখে আর্মীরা লেত্তো চাকমাকে তার বাগান থেকে জাম সংগ্রহ করতে গেলে গ্রেফতার করে বসে। পরের দিন ১০ জন গ্রামবাসীর ১৪০০ বাঁশ ৫০ ঘনফুট কাঠ আটক করে যা তারা বাজারে বিক্রির জন্য নিচ্ছিলেন। গ্রামবাসীরা হলেন-

১) আরেবানা চাকমা, পিতা- মুলুক্যা চাকমা, সাং- ঢেবাছড়ি
২) সুজল চাকমা, পিতা- নাক্কুয়া চাকমা, সাং-ঐ
৩) বিমল শান্তি চাকমা, পিতা- চন্দনাথ চাকমা, সাং-ঐ
৪) জ্যোতিলাল চাকমা, পিতা- নবীন কুমার চাকমা, সাং- ঐ
৫) জ্ঞানলাল চাকমা, পিতা- ধনকুমার চাকমা, সাং- শুকনাছড়ি
৬) অমৃতলাল চাকমা, পিতা- ঐ, সাং-ঐ
৭) শান্তিলাল চাকমা, পিতা- জয়কুমার চাকমা, সাং-ঐ
৮) সুন্দর চাকমা, পিতা- হামিত কুমার চাকমা, সাং-ঐ
৯) বুদ্ধচন্দ্র চাকমা, পিতা-বৃষমনি চাকমা, সাং-ঐ
১০) যামিনী কুমার চাকমা, পিতা- মুলুক্যা চাকমা, সাং-ঐ

২৫ জুলাই ২০০৪ তারিখে উক্ত গ্রামবাসীরা রাঙ্গমাটি শহরে তাদের এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন ও হয়রানির প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করে। ১০১ নং ঘিলাছড়ি মৌজার হেডম্যান জগদীশ তালুকদার এবং ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য লাল কৃষ্ণ চাকমা ও সুলেন্দু চাকমা প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে সেনাক্যাম্প স্থাপন দ্রুত বন্ধ করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

রাঙ্গামাটি কলেজে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুম্ম ছাত্রদের উপর সেটেলারদের হামলা

১ আগস্ট ২০০৪ বেলা ১১টার দিকে কলেজগেইট এলাকার একদল সেটেলার বাঙালী কলেজ গেইট, টিটিসি, ভেদভেদী, কল্যাণপুর এলাকার লোকজন ও রাঙ্গামাটি কলেজের জুম্ম ছাত্রদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে। রাঙ্গামাটি কলেজের ছাত্র জনৈক টুটুল চাকমা ও এজন বাঙালী ছাত্রের কথা কাটাকাটির ঘটনাটিকে সেটেলার বাঙালীরা এই সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এতে মিন্টু দেওয়ান, ১৮, পিতা- সুনীল কান্তি দেওয়ান পিঠে জখমপ্রাপ্ত হন। এছাড়া আরেকজন অটোরিক্সাচালক মারাত্মকভাবে আহত হন। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। জানা যায় যে, জুম্ম ছাত্রটি কলেজের কমনরুমে বসে ধুমপান করছিল এতে বাঙালী ছাত্রটি প্রতবাদ জানায়। একপর্যায়ে বাঙালী ছাত্রটি টুটুল চাকমাকে ছুড়ি দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু মাঠে খেলারত সেটেলার বাঙালীদের কাছে মিথ্যাভাবে প্রচার করা হয় যে, জুম্মরা বাঙালীদের মারছে। এতে মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সেটেলার জুম্ম এলাকাগুলোতে হামলা চালায়। এলাকাবাসী মনে করেন যে, এটা ছিল একটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা।

গুইমারায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদেরকে নির্বিচার অত্যাচার

২ আগস্ট ২০০৪ বিকাল ৪টার দিকে সিন্দুকছড়ি ক্যাম্পের মেজর আজিজের নেতৃত্বে তিনদলে ভাগ হয়ে একদল সেনাজওয়ান গুইমারা এলাকার নতুনপাড়ায় অপারেশন চালায়। অপারেশন চলাকালে তারা নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে।

১) আপ্রু মগ, পিতা- মৃত সুই থোয়াই মগ
২) মংহ্লাপ্রু মগ, পিতা- ঐ
৩) উথোয়াইচিং মগ, পিতা- রুইস মগ
৪) মংহ্লাচিং মগ, পিতা- ঐ
৫) ডুংফামগ, ৫০, পিতা- ক্যপ্রু মগ

প্রথম চারজন সেদিনই বিকেলে মুক্তি পান কিন্তু বাকী ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
অন্য গ্রুপের আর্মীরা নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

১) সুইপ্রু মগ, ২৫, পিতা- মংথোয়াই মগ
২) মঞ্যোচিং মগ, পিতা -অগনা মগ
৩) আপ্রুয়েক মগ, ২৭, পিতা অংগ্রি মগ
৪) উথোয়াইচিং মগ, ৩০, পিতা- রুইস মগ
৫) মংগ্রেসাই মগ, ২৭, পিতা- আপাই মগ
৬) মংথুই মগ, ৩২, পিতা- লাম্বাইয়্যে মগ

অপারেশন চলাকালীন সময়ে আর্মীরা নিম্নের মহিলাদের যৌন নিয়্যাতন চালানোর চেষ্টা করে।

১) খিমিপ্রু মগ, ২০ স্বামী- সুইপ্রু মগ
২) পাইক্রা মগ, ২২, স্বামী- গংব্রিসুই মগ

আর্মীরা পাইক্রা মগের ১ জোড়া কানের দুল ও ১৮০টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঐ একইদিনে আর্মীরা নাক্রাইপাড়া তেকে ২ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাদেরকে অমানবিকভাবে মারধোর করার পর মিথ্যা মামলা দায়ের করে গুইমারা পুলিশের হেফাজতে দেয়া হয়।

১) রামপ্রু মগ, পিতা-অংগ্য মগ
২) মং সাজাই মগ, পিতা- মং মং মগ

বরকল উপজেলায় একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

৩ আগষ্ট ২০০৪ গভীর রাতে একদল সশস্ত্র সেটেলার বাঙালী কর্তৃক বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ধন্ধছড়া গ্রামে হামলা চালিয়ে গ্রামের একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী বরুন কুমার চাকমা ও সুবর্ণা চাকমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং তাদের ১১ মাসের শিশু সন্তান কম্পন চাকমাকে নৃশংসভাবে জখম করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সেদিন রাত আনুমানিক ১১.০০ ঘটিকা সময় স্থানীয় ইউপি সদস্য তমির আলী, শহীদুল মিস্ত্রি, ইব্রাহিম ও এমদাদ এর নেতৃত্বে বরকল উপজেলাধীন কলাবন্যা এলাকার একদল সেটেলার বাঙালী ঘুমন্ত বরুন কুমার চাকমার বাড়ীতে ধারালো দা, কিরিচ ও বল্লম নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলে বরুন কুমার চাকমা (৩৩) নৃশংসভাবে নিহত হয়। নিহতের স্ত্রী সুবর্ণা চাকমা (২৮) মাথা, গলা ও হাতে-পায়ে কোপের ফলে মারাত্মকভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া একবছরের শিশুসন্তান কম্পন চাকমার ডান পা ধারালো দা, কিরিচের কোপে প্রায় ছিন্ন হয়েছে। মারাত্মক জখম অবস্থায় সুবর্ণা চাকমা ও শিশুপুত্র কম্পন চাকমাকে আজ রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অপরাহ্ন ৩.০০ ঘটিকা সময় সুবর্ণা চাকমা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য যে, নিহতের পিতা দীনমোহন চাকমাও ১৯৮৪ সালে ভূষণছড়া গণহত্যার সময় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হন।

হামলার পর পরই পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পে অবহিত করলেও বিডিআররা নিহত ও আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। শুধু তাই নয়, হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে বিডিআররা কোন প্রচেষ্টা নেয়নি বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে যে, সরকারের কায়েমী স্বার্থান্বেষী একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির জন্যে এহেন ন্যাক্কারজনক সাম্প্রদায়িক হামলা তথা হত্যাকান্ড সংঘটিত করে চলেছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক মধুপুরস্থ জনসংহতি সমিতির অফিসে ঘেরাও, ভাংচুর এবং এবং পিসিপি কর্মী নির্যাতন

গত ৬ আগষ্ট রাত ৮.৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি জোনের একদল সেনা অস্ত্র খোঁজার নামে খাগড়াছড়ির মধুপুরস্থ জনসংহতি সমিতির অফিসে ঘেরাও, ভাংচুর এবং এবং তুহিন চাকমা (২২) পীং চিকনময় চাকমা; শান্তি চাকমা (২০) পীং সুমতি চাকমা; আশীষ প্রণয় চাকমা ওরফে বাপ্পী (১৮) পীং মৃত শ্যামল প্রসাদ চাকমা এবং ছোট চাকমা ওরফে চিজি (১৬) পীং বিনোদ বিহারী চাকমা নামে পিসিপির ৪ জন কর্মীকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালায়। উক্ত হামলাকালে সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির অফিসের আসবাবপত্র, ট্রাঙ্ক, এমনকি অফিসের ভেন্টিলিটর পর্যন্ত ভাংচুর করে। অফিসে অবস্থাররত পিসিপি সদস্যদেরকে 'অস্ত্র কোথায় আছে, দেখিয়ে দাও' এই বলে রাইফেলের বাট ও লাঠি দিয়ে আঘাতসহ জঘন্যভাবে মারপিট করে। রাত ৮.৩০ থেকে ১০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে সেনা সদস্যরা পিসিপি সদস্যদেরকে একনাগাড়ে শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে গুরুতর জখম অবস্থায় পিসিপি সদস্যদের খাগড়াছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যায়।

তার আগে খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের সেনা সদস্যরা খাগড়াছড়ি-দীঘিনালার সড়কের খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ৬ মাইল এলাকায় গাড়ী থামিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পিসিপির যোগেশ চাকমা (২২), দীঘিনালা; স্বপন চাকমা (১৮) পীং রমনী রঞ্জন চাকমা, গ্রাম জোড়াব্রীজ, দীঘিনালা ও সুরজিত চাকমা (২৪) পীং ধীর কুমার চাকমা, মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি নামে ৩ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। দীঘিনালা থেকে খাগড়াছড়িতে আসার পথে আনুমানিক সকাল ১০.০০ ঘটিকায় যোগেশ চাকমাকে এবং বিকাল বেলায় অপর দু'জন সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করার পর তাদেরকে খাগড়াছড়ি ব্রিগেডে নিয়ে বেদম মারধর করা হয়েছে। হকিষ্টিক, রাইফেলের বাট, লাঠি দিয়ে তাদের অমানুষিকভাবে আঘাত করে নির্যাতন চালানো হয়। আঘাতের ফলে স্বপন চাকমার ডান ভেঙ্গে যায়। উল্লেখ্য যে, স্বপন চাকমাকে গত ২৭ মে ২০০৪ জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিস ঘেরাও করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হন। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন।

গুইমারায় রাতব্যাপী সেনা অভিযান

গত ১১ আগষ্ট ২০০৪ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন মাটিরাঙ্গা জোর ও বাল্যাছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গুইমারা এলাকার জুম্ম গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকারে প্রথমে রাত ১০টায় গুইমারার বাল্যাছড়ি স্কুল পাড়ার শশাঙ্ক ধামাই (৫৬) পিতা মৃত যতিন্দ্র ধামাই-এর বাড়ী ঘেরাও করে। এরপর রাত ১টার (১২ আগষ্ট) শশাঙ্ক ধামাই-এর পরিবারের সকল সদস্যদের ঘুম ডেকে তুলে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং তাদের সশস্ত্র সদস্য আছে কিনা, থাকলে তারা কোথায় থাকে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে। শশাঙ্ক ধামাইকে তার ক'জন ছেলেমেয়ে এবং কে কোথায় অবস্থান করছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর শশাঙ্ক ধামাইকে নিয়ে সেনা সদস্যরা সারা রাত ধরে কান্তিচন্দ্র কার্বারী পাড়া, ভক্ত কার্বারী পাড়া, রেংক্ষ্যই মারমা পাড়া ও বাল্যাছড়ি ১নং রাবার বাগান এলাকায় অভিযান চালায়। তারপর দিন (১২ আগষ্ট) সকাল ৮টায় সেনা সদস্যরা তাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার সময় সেনা সদস্যরা শশাঙ্ক ধামাইকে তারপর দিন তার ছেলেমেয়েদের ঠিকানাসহ মাটিরাঙ্গা জোনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় তাকে কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে বলে সেনা সদস্যরা হুমকি দেয়। উল্লেখ্য, শশাঙ্ক ধামাই হচ্ছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনতাময় ধামাইয়ের পিতা। গত বছর ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হন। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

জনসংহতি সমিতির সভাপতির সাথে ইউএনডিপির প্রধান প্রশাসকের সাক্ষাৎ

গত ১৮ আগষ্ট ২০০৪ ইউএনডিপি'র প্রধান প্রশাসক মি. মার্ক ম্যালক ব্রাউন পার্বত্য চট্টগ্রামে সংক্ষিপ্ত সফরে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সাথে পরিষদের অফিসকক্ষে সাক্ষাৎ করেন। তাদের আলোচনা প্রায় পৌণে একঘন্টা স্থায়ী হয়। শ্রী লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তি-উত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউএনডিপি প্রধান প্রশাসককে অবহিত করেন। তিনি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউএনডিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে ইউএনডিপি প্রকাশক জানান।

আলোচনা কালে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান ও পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুকৃতি রঞ্জন চাকমা। ইউএনডিপি'র প্রশাসকের সাথে সফল সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ইউএনডিপি'র সহকারী প্রশাসক মি. ডেভিড লক উড (ব্রিটিশ নাগরিক), ডেপুটি ডিরেক্টর মিজ জেসিকা সালেটা (স্পেনের নাগরিক) এবং ব্যাংককস্থ ইউএনডিপি'র আঞ্চলিক লিয়াজে কর্মকর্তা মিজ চেরী হার্ট, বাংলাদেশস্থ ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি ইয়োর্গেন লিসনার এবং ইউএনডিপি'র রাঙ্গামাটি ফিল্ড অফিসের প্রসেনজিত চাকমা। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইআরডি'র দু'জন পদস্থ কর্মকর্তাও সঙ্গে ছিলেন।

২১ আগষ্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে সন্ত্রাসী বোমা হামলায় জনসংহতি সমিতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

২১ আগষ্ট ২০০৪ বিকেল প্রায় ৫.২৩ ঘটিকা সময় ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু এভিন্যু-এ আয়োজিত আওয়ামী লীগের সমাবেশে সন্ত্রাসী বোমা হামলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ২২ আগস্টের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। হামলার পরদিন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, সমাবেশে আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর পরই মিছিল শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মঞ্চের চতুর্পার্শ্বে উপর্যুপরি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে হামলা চালানো হয় এবং একই সঙ্গে শেখ হাসিনার গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয়। হামলার ধরন থেকে এটা নিশ্চিত যে, পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে হত্যার উদ্দেশ্যেই এ হামলা সংঘটিত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে তিনি এই ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। পাশাপাশি তিনি হামলায় নিহত ও আহত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি জানান গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

মাটিরাঙ্গায় সেনা সদস্যদের কর্তৃক ১ জন প্রহৃত

গত ২৯ আগষ্ট ২০০৪ রাতের বেলা মাটিরাঙ্গার বাল্যাছড়ি নিবাসী লতাই ত্রিপুরা, পীং কেশরায় ত্রিপুরাকে স্থানীয় সেনা সদস্যরা বেদম প্রহার করেছে। প্রহারের কোন কারণ জানা যায়নি।

করেঙ্গাতলীতে আর্মীরা নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে সন্ত্রাসী সাজিয়েছে

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ২০ ইবিআরের করেঙ্গাতলী ক্যাম্পের জনৈক মেজর নেতৃত্বে একদল সেনা বঙ্গলতলী গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানকালে সেনা সদস্যরা বঙ্গলতলীর 'এ' ব্লকের নিরীহ অধিবাসী ছগে চাকমা (৩৮) পীং মৃত চেরেত্তে চাকমাকে ধরে বেদম প্রহার করে। এরপর ইউপিডিএফের কালেক্টর হিসেবে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। পরে স্থানীয় মুরুব্বীরা থানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে র‍্যাব মোতয়েন ও জুম্মদের হয়রানি

গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্গাপুজা, রমজান ও ঈদ উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে রেপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, র‍্যাব মোতায়েনের পর দেশে "ক্রশ ফায়ার" নামে অনেক লোক মারা গেছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন ও 'অপারেশ উত্তরণ' নামে সেনাশাসন বলবৎ রেখেছে। উপরন্তু র‍্যাব মোতায়েন করা হচ্ছে। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ইতিমধ্যে অনেক আগে থেকেই বান্দরবান পার্বত্য জেলায় র‍্যাব নামানো হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ২০০৪ র‍্যাব সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি অং শৈচিং মারমাকে আটক করে। অমানুষিক নির্যাতনের পর পরে তাকে ছেড়ে দিলেও একটা সাদা কাগজে তাকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয় এবং তারপর দিন সকাল ১০টায় পুনরায় র‍্যাব অফিনে হাজির হতে নির্দেশ দেয়।

সেনাবাহিনীর তথ্য সংগ্রহের অভিযান

অতি সম্প্রতি সেনাবাহিনী তিন পার্বত্য জেলায় স্কুল শিক্ষক, জুমচাষী, বোট চালক, হেডম্যান-কার্বারী, বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ী, মৎস্য শিকারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের তথ্য সংগ্রহ করছে। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত এনজিও এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তথ্যাবলীও সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের ছক প্রস্তুত করে উল্লেখিত পেশাজীবি ও কর্তৃপক্ষের নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্যের মধ্যে নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, গোত্র, বৈবাহিক অবস্থা, ছেলেমেয়ের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক গুণাবলী ও দুরাবস্থা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যাঙ্ক একাউন্ট, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, মাসিক বেতন (চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে), সন্ত্রাসীদের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ, নিয়োগের বৈধতা (হেডম্যান-কার্বারীদের ক্ষেত্রে), বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব, বাজার পুড়ে

যাওয়ার ইতিহাস, বাজার কমিটির সদস্যদের বিবরণ, ব্যবসায়ীদের বিবরণ এবং বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের শতকরা অবস্থান, মৎস্য শিকারের সরঞ্জামাদির বিবরণ, মৎস্য সমিতির নাম, মৎস্য শিকারের ক্ষেত্র ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র ইত্যাদি রয়েছে। উক্ত তথ্যাবলী সরবরাহের জন্য উল্লেখিত পেশাজীবি ও কর্তৃপক্ষসমূহকে সেনাবাহিনী চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। এনজিওদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর এই ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের অভিযান জনমনে চরম আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চার করেছে।

বাঘাইছড়ির মেদেনীপুরে সেনা সদস্য কর্তৃক দু'জন কাউন্যাকে বেদম প্রহার

গত ৪ অক্টোবর ২০০৪ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খাগড়াছড়ির মেহেনীপুর সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের উত্তর পাবলাখালী গ্রামের কিরণ চাকমা (১৯) পিতা বিমলেন্দু চাকমা ও চাগা চাকমা (২২) পিতা প্রিয়লাল চাকমাকে আটক করে বেদম মারধর করে। একরাত্রি ক্যাম্পে রাখার পর তারপর দিন তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

সার্বোয়াতলী গ্রামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে আর্মীরা পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে

গত ৫ অক্টোবর ২০০৪ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রাজানগর সেনা জোনের কম্যান্ডার কর্তৃক উপজেলার সার্বোয়াতলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে কিরণ চাকমা (২২) পিতা অনুধ্বজ চাকমাকে আটক করা হয়। কি কারণে তাকে আটক করা হয়েছে তা জানা যায়নি। পরে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংশোধন ও সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বাড়ানোর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ রক্ষায় ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংশোধন ও সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বাড়ানোর সুপারিশ এবং শান্তিবাহিনী নামে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৭ অক্টোবর ২০০৪ জাতীয় দৈনিক আজকের কাগজে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বন রক্ষায় শান্তি চুক্তি সংশোধন ও সেনা ক্যাম্প বাড়ানোর সুপারিশ' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, "জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ রক্ষায় ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংশোধন, সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বাড়ানোসহ ১৩ দফা সুপারিশ করেছে।" সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, "...শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এবং স্থানীয় কিছু বাঙালি দুস্কৃতিকারী কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত।"

গত ১৯ অক্টোবর ২০০৪ জনসংহতি সমিতির প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কোনরূপ সংশোধনী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্যবাসী কখনোই গ্রহণ করবে না। অপরদিকে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদানের মাধ্যমে 'শান্তিবাহিনী' বিলুপ্ত হয়েছে। তাই কাঠ পাচারে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জড়িত থাকার তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি সভায় বানোয়াট ও কল্পনা প্রসূত শান্তিবাহিনী সৃষ্টি করে বনজ সম্পদ পাচারে বন বিভাগের অসাধু ও দূনীর্তিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা বৈ আর কিছু নয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। #

৩ আগষ্ট'০৪ রাতে বরকলের ধন্ধছড়ায় সেটেলার বাঙালীদের নৃশংসতার শিকার কম্পন চাকমা (১)। উক্ত হামলায় তার মা বাবাও নিহত হন। উল্লেখ যে, ভূষনছড়া গণহত্যায় তার দাদুও সেটেলারদের হাতে খুন হন।

৮ ডিসেম্বর'০৩ হরতাল চলাকালে খাগড়াছড়ি জিরো মাইল স্থানে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা পিকেটারদের ওপর গুলি বর্ষণ করলে পিতৃ-মাতৃহীন জুয়েল ত্রিপুরা (১০) গুরুতরভাবে আহত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ১০ নভেম্বর ২০০৪ প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০ টাকা

JUMMA SAMBAD BULLETIN
Newsletter of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)
Issue No. 34, 14th Year, 10 November 2004
Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh
Tel : +880-351-61248, E-mail:pcjss@hotmail.com, pcjss1972@yahoo.com